এ বইয়ে যা আছে

বুদ্ধিবৃত্তিক যুদ্ধের ইতিহাস

বুদ্ধিবৃত্তিক যুদ্ধের কিছু উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্র
- ওরিয়েন্টালিজম / প্রাচ্যতত্ত্ব
- আল-ইসতি'মার বা সাম্রাজ্যবাদ
- আল-আওলামা বা বিশ্বায়ন
- আত-তানসির/আর রিদ্দাহ বা খ্রিস্টধর্মে ধর্মান্তরকরণ/ধর্মচ্যুত করা

বুদ্ধিবৃত্তিক ক্রুসেডের আতুড়ঘরে প্রসূত কিছু চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গি

বৃদ্ধিবৃত্তিক ক্রুসেডের উপকরণ
- প্রচলিত বিভিন্ন ধর্ম ও দৃষ্টিভঙ্গি
- সনাতন হিন্দুধর্ম
- বৌদ্ধধম
- ইয়াহুদিজম ও জায়নবাদ
- খ্রিস্টধর্ম

প্রচলিত বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি
- ফিলোসফি
- রিনেইসেন্স (Renaissance) বা জ্ঞানের পুনর্জাগরণ আন্দোলন
- যুক্তিবাদ (Rationalism)
- প্রয়োগবাদ (Pragmatism)
- যৌক্তিক ইতিবাচকতার দর্শন (Logical Positivism)

পশ্চিমাবিশ্বপ্রসূত কিছু জীবনব্যবস্থা ও দর্শন
- হিউমেনিজম (Humanism) বা মানবধর্ম
- আলোকায়ন আন্দোলন (Enlightenmaent Movement)
- রোমান্টিজম (Romanticism)
- সেক্যুলারাজিম বা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ
- লিবারেলিজম বা প্রজাতন্ত্র
- কমিউনিটারিনিজম

পুঁজিবাদ (Capitalism)

সমাজতন্ত্র (Socialism)

অস্থায়ী বিক্রয়কেন্দ্র
১২৮ আদর্শনগর, মধ্যবাড্ডা, ঢাকা।
019 24 07 63 65

শাখা বিক্রয়কেন্দ্র
দোকান নং : ১, আক্তারম্যাউন্ড
ইসলামি টাওয়ার বাংলাবাজার, ঢাকা।
01715 02 31 18

প্রচ্ছদ : ইবাদ বিন সিদ্দিক, অলঙ্করণ : মোবারক হোসেইন সাদী

বুদ্ধিবৃত্তিক ক্রুসেড

আবদুল্লাহ আল ফারুক [অনূদিত]

THE IDEOLOGICAL CRUSADE

ইসমাঈল রায়হান

বুদ্ধিবৃত্তিক ক্রুসেড

আবদুল্লাহ আল ফারুক

[অনূদিত]

সূচি

অনুবাদকের আলাপন ১৭
প্রকাশকের কথা ১৯
লেখকের প্রাককথা ২১

ভূমিকা

চিন্তাযুদ্ধ (Ideological War) পরিচিতি ২৫
চিন্তাযুদ্ধের সংজ্ঞা (Definition) ২৫
আরেকটি সংজ্ঞা ২৫
চিন্তাযুদ্ধের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ২৫
চিন্তাযুদ্ধ শাস্ত্র অধ্যয়নের উদ্দেশ্য ২৬
চিন্তাযুদ্ধ শাস্ত্র (علم الغزو الفكري) এর সংজ্ঞা ২৬
চিন্তাযুদ্ধ শাস্ত্র (علم الغزو الفكري) এর আলোচ্য বিষয় ২৬
চিন্তাযুদ্ধ শাস্ত্র (علم الغزو الفكري) এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ২৬
চিন্তাযুদ্ধ শাস্ত্র (علم الغزو الفكري) এর গুরুত্ব ২৬
সামরিক যুদ্ধ ও বুদ্ধিবৃত্তিক যুদ্ধের মাঝে পার্থক্য ২৭

বুদ্ধিবৃত্তিক যুদ্ধের ইতিহাস

রাশেদার যুগে বুদ্ধিবৃত্তিক যুদ্ধ ২৯
উমাইয়া ও আব্বাসি শাসনামলে বুদ্ধিবৃত্তিক যুদ্ধ ৩০
ওই যুগে বুদ্ধিবৃত্তিক আক্রমণকারীদের ব্যর্থতার কারণ ৩০

ক্রুসেড যুদ্ধ

ক্রুসেডের সংজ্ঞা ৩২
যুগে যুগে ক্রুসেড যুদ্ধ ৩২
ক্রুসেড যুদ্ধের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ৩২
প্রথম ক্রুসেড যুদ্ধ ৩৩
ইমাদুদ্দিন যিনকি ৩৩

নূরুদ্দিন যিনকি ও দ্বিতীয় ক্রুসেড যুদ্ধ ৩৩
সুলতান সালাহউদ্দিন আইউবি ও তৃতীয় ক্রুসেড যুদ্ধ ৩৪
চতুর্থ ক্রুসেড যুদ্ধ ৩৪
পঞ্চম ক্রুসেড যুদ্ধ ৩৪
ষষ্ঠ ক্রুসেড যুদ্ধ ও জার্মানদের হাতে কুদসের পতন ৩৪
সুলতান বাইবার্স ও সপ্তম ক্রুসেড যুদ্ধ ৩৫
অষ্টম ক্রুসেড যুদ্ধ ৩৫
সেন্ট লুইস— ইউরোপে বুদ্ধিবৃত্তিক ক্রুসেডের প্রতিষ্ঠাতা ৩৫

প্রথম অধ্যায়
চিন্তিক ও মতাদর্শিক যুদ্ধের রণাঙ্গন

বুদ্ধিবৃত্তিক যুদ্ধের প্রথম ক্ষেত্র

الإستشراق [আল ইসতিশরাক] ওরিয়েন্টালিজম / প্রাচ্যতত্ত্ব

শাব্দিক অর্থ ৩৮
ওরিয়েন্টালিজমের সংজ্ঞা (Definition) ৩৮
المستشرق [আল-মুসতাশ্‌রিক]
ওরিয়েন্টালিস্ট (Orietalist) / প্রাচ্যবিদ ৩৯
ইসতিশ্‌রাকের ইতিহাস (Histoy of Orientalism) ৩৯
প্রথম যুগ : ১ম হি. থেকে ৭০০ হি. পর্যন্ত ৩৯
দ্বিতীয় যুগ : ১৩০০ ঈ. থেকে ১৮০০ ঈ. পর্যন্ত ৪০
তৃতীয় যুগ : ১৮০১ ঈ. থেকে ১৯২৪ ঈ. পর্যন্ত ৪০
চতুর্থ যুগ : ১৯২৫ ঈ. থেকে ১৯৭২ ঈ. পর্যন্ত ৪১
পঞ্চম যুগ : ১৯৭৩ ঈ. থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত ৪১
মার্কিন প্রাচ্যতত্ত্ব ৪২
ইসতিশরাকের শৈলী ৪২
প্রাচ্য সম্পর্কে গবেষণার প্রেরণা শক্তি ৪৩
ক্রুসেডীয় প্রেরণা শক্তি ৪৩
রাজনৈতিক ও সাম্রাজ্যবাদী প্রেরণা শক্তি ৪৪
আত্মরক্ষার প্রেরণা শক্তি ৪৬
বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক প্রেরণা শক্তি ৪৭
জ্ঞান-বিজ্ঞানকেন্দ্রিক প্রেরণা শক্তি ৪৭

প্রাচ্যবিদদের দুটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য ৪৭
প্রাচ্যতত্ত্বের পুঁজি ও উপকরণ ৪৮
প্রাচ্যবিদদের আক্রমণের পদ্ধতি ও গবেষণার মাণদণ্ড ৪৯
প্রাচ্যবিদদের সফলতার নেপথ্য কারণ ৪৯
প্রাচ্যতত্ত্বের প্রতিপাদ্য ৪৯
প্রাচ্যতত্ত্বের মুকাবিলা কীভাবে করতে হবে? ৫০
কয়েকজন প্রসিদ্ধ প্রাচ্যবিদ ৫১

বুদ্ধিবৃত্তিক যুদ্ধের দ্বিতীয় ক্ষেত্র

الاستعمار [আল-ইসতি'মার] বা সাম্রাজ্যবাদ

সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবের বুনিয়াদ ৫৪
মুসলিমবিশ্বের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী অপচেষ্টার প্রথম যুগ ৫৪
প্রতিপক্ষের ব্যর্থতার কারণ ৫৬
চিন্তাধারা, মূল্যবোধ ও মানসিকতা পরিবর্তনের যুগ ৫৬
যে চারটি ঘটনার ফলে সাম্রাজ্যবাদী চিন্তা প্রসারিত হয় ৫৬
সাম্রাজ্যবাদের আসল যুগ ৫৭
প্রথম স্তর : অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা ও বাণিজ্যিক শক্তিমত্তা ৫৭
দ্বিতীয় স্তর : মুসলিমবিশ্বের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক
ও সামরিক অবরোধ ৫৮
তৃতীয় স্তর : বাণিজ্য ও অর্থব্যবস্থায় ক্রমবর্ধবান উন্নতি ৫৯
চতুর্থ স্তর : মুসলিমজাহানের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা ৫৯
পঞ্চম স্তর : উসমানি খেলাফতের পতন ৬১
খিলাফত পুনপ্রবর্তনের স্বপ্নের মৃত্যু ৬১
ষষ্ঠ স্তর : মুসলিম জাহানকে শতধা বিভক্ত করা ৬২
বিশৃঙ্খলা অব্যাহত রাখার কৌশল ৬২
সপ্তম স্তর : মুসলিম জাহানের স্বাতন্ত্র্য বিনাশ.....৬৪

বুদ্ধিবৃত্তিক যুদ্ধের তৃতীয় ক্ষেত্র

العولمة [আল-আওলামা] বা বিশ্বায়ন

মার্কিন ও ইহুদি সাম্রাজ্যবাদ ও প্রাচ্যবাদ ৬৬
মুসলিম বিশ্বই কেন বিশ্বায়নের আসল লক্ষ্য? ৬৬

গ্লোবালাইজেশনের চারটি ক্ষেত্র ৬৭
১. রাজনৈতিক গ্লোবালাইজেশন ৬৭
২. অর্থনৈতিক গ্লোবালাইজেশন ৬৮
প্রথম পদক্ষেপ
স্বর্ণের সবগুলো ভাণ্ডার জবরদখল ৬৮
দ্বিতীয় পদক্ষেপ
আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান ৬৮
তৃতীয় পদক্ষেপ
আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক চুক্তিগুলো কার্যকর ৬৯
চতুর্থ পদক্ষেপ
মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি ছড়িয়ে দেওয়া ৬৯
অর্থনৈতিক গ্লোবালাইজেশনের প্রভাব ও ক্ষয়-ক্ষতি ৭০
৩. সাংস্কৃতিক গ্লোবালাইজেশন ৭০
৪. সামাজিক গ্লোবালাইজেশন ৭১
সামাজিক গ্লোবালাইজেশন ও জাতিসংঘ ৭১
কীভাবে গ্লোবালাইজেশনের মুকাবিলা করতে হবে? ৭২

বুদ্ধিবৃত্তিক যুদ্ধের চতুর্থ ক্ষেত্র

التنصير / الردة [আত-তানসির/আর রিদ্দাহ]

খ্রিস্টধর্মে ধর্মান্তরকরণ ও ধর্মচ্যুত করা

التنصير [আত-তানসির] এর সংজ্ঞা ৭৪
খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিতকরণের ইতিহাস ৭৪
ভারতবর্ষে মিশনারি তৎপরতার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ৭৫
মাঠপর্যায়ে কর্মরত কিছু খ্রিস্টান মিশনারি ৭৬
ধর্মান্তরকরণের বিভিন্ন স্তর ৭৭
ধর্মান্তরকরণের মাধ্যম ৭৭
মুসলিমদের তিনটি দুর্বলতা ৭৮
মিশনারীদের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য ৭৮
মিশনারিদের জন্যে পথনির্দেশনা ও প্রশিক্ষণের কারিকুলাম ৭৯
মিশনারি তৎপরতা প্রতিহত করার উপায় ৮০

أفكار الغزو الفكري

বুদ্ধিবৃত্তিক ক্রুসেডের আঁতুড়ঘরে প্রসূত কিছু চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গি

العلمانية [আল-আলমানিয়াহ] বা সেক্যুলারিজম.....৮২
সেক্যুলারিজমের বুনিয়াদি লক্ষ্য ৮৩
সেক্যুলারিজমের তিনটি বিপদজনক হাতিয়ার ৮৩
التغريب [আত-তাগরিব] পাশ্চাত্যকরণ ৮৪

বৃদ্ধিবৃত্তিক ক্রুসেডের উপকরণ

১. শিক্ষাব্যবস্থা ৮৬
২. মিডিয়া, প্রচারমাধ্যম ৮৮
৩. তথ্যের উপকরণ ৮৯
৪. রাজনীতির ময়দান ৯০
৫. সংবিধান ৯০
৬. জীবিকা ও বাণিজ্য ৯১
৭. সেবাসংস্থা, এনজিও ৯১
৮. আধুনিকমনস্ক ইসলামি চিন্তাবিদ ৯১
৯. শিল্পকলা ৯১
১০. সাহিত্য ৯২
১১. খেলাধুলা ও বিনোদন ৯২
১২. সংস্কৃতি জগতের হিরো ৯২
১৩. আঞ্চলিক কৃষ্টি-কালচার ৯২
১৪. জাহেলি সাম্প্রদায়িকতার উন্মেষ ৯২
১৫. যোগ্য নেতৃত্ব সম্পর্কে মুসলিমদের মনে ঘৃণা ছড়ানো ৯৩
১৬. নারী স্বাধীনতা ৯৩
নারীস্বাধীনতার জন্যে মিথ্যা প্রচারাভিযান ৯৩
নারীস্বাধীনতার আড়ালে পর্দাহীনতার আহ্বান ৯৫
পর্দাহীনতার মন্দ পরিণতি ৯৫
পশ্চিমা সভ্যতা নারীকে কী দিয়েছে? ৯৬

বুদ্ধিবৃত্তিক ক্রুসেড কীভাবে মুকাবিলা করতে হবে?..... ৯৭
আমাদের দুর্বলতা ৯৭
আমাদের শক্তিমত্তা ৯৮
শত্রুপক্ষের দুর্বল দিক ৯৮
কাজ করার পদ্ধতি ৯৯
আমাদের লক্ষ্য কী হবে? ৯৯
কাজ করার আবশ্যিক বৈশিষ্ট্য ১০০
কাদের ওপর কাজ করতে হবে? ১০০
আমাদের কাজের ক্ষেত্র ১০১
আমাদের হাতিয়ার কী হবে? ১০১
আমাদের শক্তির কেন্দ্রবিন্দু ১০১

দ্বিতীয় অধ্যায়
প্রচলিত বিভিন্ন ধর্ম ও দৃষ্টিভঙ্গি

প্রচলিত বিভিন্ন ধর্ম ও দৃষ্টিভঙ্গি..... ১০৩
সনাতন হিন্দুধর্ম..... ১০৪
হিন্দু ধর্ম ১০৪
ঈশ্বর পরিচিতি ১০৫
বিশ্বাস ১০৫
১. ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস ১০৬
২. বেদের ওপর বিশ্বাস ১০৭
৩. পুনর্জন্মে বিশ্বাস ১০৮
প্রথা, উৎসব-পার্বন ১০৮
দিওয়ালি... লক্ষ্মী পূজা ১০৮
হোলি ১০৯
বসন্ত পূজা ১০৯
সতিদাহ ১০৯
বলি ১০৯
হিন্দুধর্মের ইতিহাস ১০৯

জাত-পাত ১১০
মনুশাস্ত্র ১১১
হিন্দুদের ধর্মীয় প্রতীক ১১১
হিন্দুধর্মের চৈন্তিক প্রভাব ১১১
হিন্দু মিডিয়ার আক্রমণ ১১১
ধর্মান্তর ফিতনা ১১২

বৌদ্ধধর্ম..... ১১৩
হিনযান গোষ্ঠী ১১৩
মহাযান বৌদ্ধমত ১১৪

ইহুদিজম ১১৫
ইহুদি জাতির ইতিহাস ১১৬
হযরত মুসা পরবর্তী যুগ ১১৬
কুযাত যুগ ১১৬
মুলুক যুগ ১১৬
ইনকিসাম (বিভাজনের) যুগ ১১৬
বাবেলের বশ্যতা ১১৭
নিষ্কৃতির যুগ ১১৭
গ্রিক ও রোমানদের অধীনতা ১১৭
লাঞ্ছনা ও অবমাননার যুগ ১১৮
ইসলামের সূচনাকাল হতে আজোব্দি ১১৮
বর্তমান সময়ের ইহুদিদের বংশধারা ১১৯
ইহুদি ধর্মের উৎস ১২০
১. বিকৃত তাওরাত ১২০
তাওরাতে বিভিন্ন নবি সম্পর্কে বিশ্বাস ১২০
পরকাল সম্পর্কে বিশ্বাস ১২১
২. তালমুদ (Talmud) ১২১
তালমুদের কিছু আলোচ্য বিষয় ১২২
ভিন্ন সম্প্রদায় সম্পর্কে বিশ্বাস ১২২
বিশ্বজয় সম্পর্কে বিশ্বাস ১২২

খ্রিস্টানদের সম্পর্কে বিশ্বাস ১২৩
৩. কাব্বালা (Cabbala) ১২৪
প্রটোকলসে কী আছে? ১২৫
বিভিন্ন ইহুদি সংগঠন ও আন্দোলন ১২৭
ট্যাম্পেলার্স ১২৭
২. ফ্রি ম্যাসনরি (Free Masonry) (الماسونية) ১২৮
লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ১২৯
১. ইহুদিদের নিরাপত্তা ও ইহুদিজমের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা ১২৯
২. অন্য সবগুলো ধর্মের বিলোপ ১৩০
৩. ধর্মহীনতা, নাস্তিকতা ও মুক্তমনা মতবাদের বিস্তার ১৩০
ফ্রি মেসনারির ইতিহাস ১৩০
মানুষ কেন ফ্রি ম্যাসনরির দিকে ঝুঁকছে? ১৩২
৩. ইলুমিনাতি সংগঠন ১৩২
বিভিন্ন ইহুদি আন্দোলন ১৩৪
১. জায়নবাদ/সাহইয়ূনিয়্যাহ (Zionism) ১৩৪
২. এলিজাহ আন্দোলন ১৩৬
ইহুদিদের প্রকাশ্য সংগঠন ১৩৮
১. বিনি বার্থ সোসাইটি ১৩৮
২. লায়ন্স ক্লাব ১৩৮
৩. রোটারি ইন্টারন্যাশনাল ১৩৮
ইহুদি নিয়ন্ত্রিত আন্তর্জাতিক সংস্থা ১৩৯
১. লিগ অফ নেশন্স ১৩৯
২. জাতিসংঘ ১৩৭

খ্রিস্টধর্ম..... ১৪০
খ্রিস্টধর্মের সংজ্ঞা ১৪০
খ্রিস্টধর্মের মৌলিক বিশ্বাস ১৪০
১. ত্রিত্ববাদ ১৪০
২. মাসিহের ঈশ্বরপুত্র হওয়ার বিশ্বাস ১৪১
৩. ইনকারনেশন বিশ্বাস ১৪১

৪. ঈসা মাসিহের ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার বিশ্বাস ১৪১
৫. পুনর্জন্মে বিশ্বাস ১৪১
৬. প্রায়শ্চিত্তে বিশ্বাস ১৪১
খ্রিস্টবাদের মূল উৎস ১৪২
দ্যা অল্ড টেস্টামেন্ট ১৪২
দ্যা নিউ টেস্টামেন্ট ১৪২
বর্তমানে সহজলভ্য চারটি ইঞ্জিলের মূল্যায়ন ১৪৩
খ্রিস্টধর্মের উপাসনা ও প্রথা ১৪৩
বিদ্যমান খ্রিস্টধর্মের ভিত্তি ১৪৫
খ্রিস্টধর্মের ইতিহাস ১৪৪
খ্রিস্টধর্মের ইতিহাসের তিন যুগ ১৪৭
প্রথম যুগ : ধর্মপ্রচার ও পরীক্ষা ১৪৭
দ্বিতীয় যুগ : কাউন্সিলের যুগ ১৪৭
তৃতীয় যুগ : বিস্তৃতি ও প্রসারের যুগ ১৪৮
প্রথম যুগ : অন্ধকার যুগের প্রথমাংশ ১৪৮
মধ্যযুগ : অন্ধকারাচ্ছন্ন সময়ের দ্বিতীয় যুগ ১৪৮
ইয়ান হুইস ও জেরোমের শুদ্ধি আন্দোলন ১৪৯
রিফরমেশন বা ধর্মের শুদ্ধি আন্দোলন ১৪৯
যুক্তিবাদের যুগ ১৪৯
মর্ডানিজম বা আধুনিকতাবাদের যুগ ১৫০
কাউন্টার রিফরমেশন বা জবাবি আন্দোলন ১৫০
যিসুস আন্দোলন.....১৫০
ধর্ম পুনঃপ্রবর্তনের আন্দোলন ১৫১
একবিংশ শতাব্দীতে ক্রিশ্চিয়ান গির্জা ১৫১

প্রচলিত বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি

বস্তুবাদি দর্শনের আক্রমণ ১৫২
ফিলোসফি (Philosophy) এর সংজ্ঞা ১৫২
ফিলোসফির ইতিহাস ১৫২
১. গ্রিক যুগ ১৫৩
ফিলোসফিস্টদের বিভ্রান্তি ও পথচ্যুতি ১৫৪

২. রোমান যুগ ১৫৫
৩. মধ্যযুগ : ঈসায়ি যুগ ১৫৬
৪. রেনেসাঁস (Renaissance) বা জ্ঞানের পুনর্জাগরণ আন্দোলন ১৫৬
৫. Rationalism বা যুক্তিবাদের যুগ ১৫৭
৬. শিল্পবিপ্লবের যুগ ১৫৮
৭. দ্বিচারিতা ও মিথ্যা ধর্মের যুগ ১৫৯
প্রয়োগবাদ (Pragmatism) ১৫৯
যৌক্তিক ইতিবাচকতার দর্শন (Logical Positivism) ১৫৯
৮. ইসলামের পুনরুজ্জীবন : একবিংশ শতাব্দী ১৬০

পশ্চিমাবিশ্বপ্রসূত বিকল্প জীবনব্যবস্থা

১. হিউমেনিজম (Humanism) বা মানবধর্ম ১৬১
২. আলোকায়ন আন্দোলন (Enlightenmaent Movement) ১৬১
৩. রোমান্টিসিজিম (Romanticism) ১৬৩
সেক্যুলারাজিম বা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ..... ১৬৪
লিবারেলিজম বা প্রজাতন্ত্র ১৬৪
কমিউনিটারিনিজম ১৬৫

পুঁজিবাদ ও সোশালিজম

পুঁজিবাদ (Capitalism) ১৬৮
সমাজতন্ত্র (Socialism) ১৬৯
সোশালিজম ও কমিউনিজমের মাঝে পার্থক্য ১৭০
সোশালিজমের বাহ্যিক লক্ষ্য ও মূল লক্ষ্য..... ১৭০
ইসলামি সোশালিজম ১৭১
আলোচনার সারাংশ ১৭২
উৎসগ্রন্থ..... ১৭৪

অনুবাদকের আলাপন

কিছু বই থাকে, যা স্পর্শ করে পাঠকের বোধ ও অনুভূতি। যে বইয়ের একেকটি বাক্যের আড়ালে লুকিয়ে থাকে অজস্র পৃষ্ঠার অধ্যয়ন। তেমনই একটি বই 'বুদ্ধিবৃত্তিক ক্রুসেড'।

আমাদের সরলতাকে উপজীব্য করে কীভাবে একের পর এক বুদ্ধিবৃত্তিক আক্রমণ রচনা করে চলছে আমাদের প্রতিপক্ষ, তার অসামান্য খতিয়ান উঠে এসেছে এ বইয়ে।

- সাম্রাজ্যবাদ কীভাবে প্রাচ্যবাদের কাঁধে ভর করে চষে বেড়াচ্ছে আমাদের মনোজগত...
- গ্লোবালাইজেশন কীভাবে অন্তসারশূন্য করছে আমাদের চেতনা...
- সেক্যুলারিজমের বিষবাষ্পে কীভাবে নীল হচ্ছে আমাদের কোমল বোধ...
- ইহুদিদের গুপ্ত সংগঠন আর প্রকাশ্য সংস্থাগুলো কীভাবে কেটে দিচ্ছে আমাদের প্রতিরোধব্যূহের একেকটি শেকড়...
- জায়নবাদের অক্টোপাশ কীভাবে জেঁকে বসছে মুসলিমবিশ্বের মানচিত্রে...
- গ্রিকদর্শন, যুক্তিবাদ, মুক্তচিন্তা, হিউমেনিজম, ইনলাইটম্যান্ট মুভমেন্ট, রোমান্টিজম, কমিউনিট্রিনিজম কীভাবে সরাসরি ইসলামের প্রতিপক্ষ হয়ে ধর্মহীন পৃথিবী গড়ার খোয়াব বুনছে...

সচেতন পাঠকের এমন কিছু কৌতূহল পুরণ করতেই এসেছে 'বুদ্ধিবৃত্তিক ক্রুসেড'।

শত বছরের পথপরিক্রমায় অন্যসব ধর্ম যখন নিজেদের অস্তিত্ব খুইয়ে বসেছে, তখন কীভাবে অবাক বিস্ময়ে টিকে আছে ইসলাম! ইউরোপের

চোরবালিতে যেখানে ইহুদিজম পথ হারিয়েছে...

পশ্চিমাবিশ্বকে আদর্শিক পথ দেখাতে যেখানে খ্রিস্টধর্ম ব্যর্থ হয়েছে...

বৌদ্ধধর্ম যেখানে নিজ আঁতুড়ঘর ভারতবর্ষ থেকে অস্তিত্ব খুইয়ে বসেছে...

আর্য আর দ্রাবিড় সম্প্রদায়ের মোহনায় এসে হিন্দুধর্ম যেখানে জট পাকিয়ে ফেলেছে...

সেখানে কীভাবে মুহুর্মুহু আক্রমণ, অস্তিত্ববিনাশী ষড়যন্ত্র আর ভেতর-বাইরের শত্রুদের প্রবল বিপর্যয় কাটিয়েও সমুজ্জ্বল মহিমায় টিকে আছে ইসলামের চিরন্তন আদর্শ! এমন কিছু শক্তিময় প্রেরণা নিয়ে পাঠকের খোরাক জোগাতে এসেছে 'বুদ্ধিবৃত্তিক ক্রুসেড'।

অন্ধকার, হতাশা ও অন্যায় দু'পায়ে পিষে একবিংশ শতাব্দীতে রচিত হবে ইসলামের বিজয় দাস্তান, দিগন্তে ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে নতুন সূর্যের রূপালি বিভা, তা জানাতেই আপনার দোরগোড়ায় এসেছে 'বুদ্ধিবৃত্তিক ক্রুসেড'।

আবদুল্লাহ আল ফারুক
আশুলিয়া, ঢাকা

প্রকাশকের কথা

আমিরুল মুমিনিন উমর ইবনুল খত্তাব রদি.এর শাসনামলে বাইতুল মাকদিস মুসলিমদের হাতে আসে। সাড়ে চারশ বছর অধিকৃত থাকার পর সর্বপ্রথম ৪৯৬ হি. / ১০৯৯ ঈ. বাইতুল মাকদিস মুসলিমদের হাতছাড়া হয়। যদিও সেদিন ৭০ হাজার মুসলিম বুকের তাজা রক্ত ঢেলে প্রতিরোধের চেষ্টা করেছিলেন।

তবে ইতিহাসের পাতা ঘুরতে খুব বেশি সময় লাগেনি। মাত্র ২৬ বছরের মাথায় শুরু হয় উদ্ধার অভিযান। উম্মাহর তিন সেনাপতির অক্লান্ত পরিশ্রম আর ৬৫ বছরের রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম শেষে সুলতান সালাহউদ্দিন আইউবির হাতে ৫৮৩ হি. মুতাবেক ১১৮৭ ঈসাব্দে শত্রুমুক্ত হয় আমাদের প্রথম কেবলা বাইতুল মাকদিস। ইতিহাসের এই অন্ধকারতম সময়ে এই পুণ্যভূমি আমাদের হাতছাড়া ছিল মাত্র ৮৮ বছর।

৬২৪ হিজরিতে বাইতুল মাকদিস দ্বিতীয়বারের মত মুসলিমদের হাতছাড়া হয়; কিন্তু এর মাত্র ১৮ বছরের মাথায় ৬৪২ হি. / ১২৪৪ ঈসাব্দে আল মালিকুস সালেহের নেতৃত্বে খাওয়ারজিমি সৈন্যদের বীরত্বগাথায় আইউবির আমানত 'বাইতুল মাকদিস' আমাদের হাতে ফিরে আসে।

সর্বশেষ ১৯৬৭ সালে আরব-ইসরাইল যুদ্ধের পর বাইতুল মাকদিস মুসলিমদের হাতছাড়া হয়। অর্থাৎ ৭২৩ বছর অধিকৃত রাখার পর আজ থেকে ৫০ বছর আগে প্রথম কেবলা আল-মসজিদুল আকসা আমাদের হাতছাড়া হয়েছিল।

বিগত দু'হাজার বছরের ইতিহাস এ কথার প্রমাণ বহণ করে যে, বাইতুল মাকদিস যুগে যুগে ইতিহাসের বীর জাতির অধিকৃত ছিল। মুসলমান, খ্রিস্টান ও ইহুদি— এই তিন জাতির জনগোষ্ঠীর কাছে সম্মানিত হওয়ার কারণে সবসময় বিশ্বজয়ী শক্তি বাইতুল মাকদিস অধিকৃত রাখতে পেরেছে।

বিগত দেড় হাজার বছরের ইতিহাস এই অমোঘ সত্যও স্বীকার করে যে, তিন মুদ্দতে (৮৮+১৮+৫০) মাত্র ১৫৬ বছর বাইতুল মাকদিস মুসলিমদের হাতছাড়া ছিল। বাকি ১২৫০ বছরেরও অধিককাল মুসলিমদের হাতেই সুরক্ষিত ছিল এই পবিত্র ভূমির সম্মান।

যদিও ১৯৫৭ সালে বাইতুল মাকদিস দখলের মাধ্যমে মুসলিমদের বিরুদ্ধে খ্রিস্টান-ইহুদি সম্মিলিত শক্তির সামরিক ক্রুসেডের বিরতি ঘটে; কিন্তু ভবিষ্যতে যেন কোনোদিন মুসলিম জাতি এই পবিত্র ভূমি উদ্ধার করতে না পারে, এজন্যে বর্তমান সময়ে তারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে অব্যাহত রেখেছে বুদ্ধিবৃত্তিক ক্রুসেড। ইতিহাস সাক্ষী, এই বুদ্ধিবৃত্তিক ক্রুসেডের ভয়াবহতা সামরিক ক্রুসেডের চেয়ে কোনো অংশেই কম নয়। তাদের সেই বুদ্ধিবৃত্তিক ক্রুসেড কী? কীভাবে তারা তাদের সেই চিন্তাযুদ্ধ সাফল্যের সঙ্গে চালিয়ে যাচ্ছে? প্রাচ্যতত্ত্ব, সাম্রাজ্যবাদ, বিশ্বায়ন, নাস্তিকতা, সেক্যুলারিজম, মর্ডানিজম কীভাবে সেই বুদ্ধিবৃত্তিক ক্রুসেডের পরিবাহক হয়ে আমাদের প্রতিরোধশক্তি নিঃশেষ করছে, সে কথাই বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে উঠে এসেছে। ছদ্মবেশী ক্রুসেডারদের হাতে আমাদের জাতিসত্ত্বার নীরব হত্যার কথাচিত্র 'বুদ্ধিবৃত্তিক ক্রুসেড'।

বইটি পাকিস্তানের গবেষণাপ্রতিষ্ঠান জামিয়াতুর রশিদের শরিয়াহ অনুষদের পাঠ্যভুক্ত। অনেক প্রতিষ্ঠানে দাওয়াহ ও তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব বিভাগে বইটি সহযোগী গ্রন্থ হিসেবে পঠিত হচ্ছে।

বাংলাভাষী পাঠকদের হাতে একটি সময়সচেতন-ইতিহাসআশ্রিত বই তুলে দেওয়ার আগ্রহ থেকেই বইটির বাংলা রূপান্তর।

ওবায়দুল্লাহ
মধ্যবাড্ডা, ঢাকা

লেখকের প্রাককথা

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম।

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর।

দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁর প্রেরিত রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর।

বর্তমান সময়ে মুসলিম উম্মাহ বাতিলপন্থীদের পক্ষ থেকে একটি সর্বগ্রাসী ও মারাত্মক ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ চৈন্তিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও মতাদর্শিক আক্রমণের শিকার। এই আক্রমণ প্রতিহত করতে হলে অবশ্যই সকল ধর্মীয় ও আধুনিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পাঠ্যক্রমে الغزو الفكري বা *চিন্তাযুদ্ধ/বুদ্ধিবৃত্তিক ক্রুসেড* শিরোনামে একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র যুক্ত করতে হবে।

বেশ কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ এই প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন; কিন্তু এ শাস্ত্রের ওপর পাঠ্যবইয়ের অপ্রতুলতা, এমনকি আমাদের মাতৃভাষায় এ জাতীয় বইয়ের দুষ্প্রাপ্যতা সেই উদ্যোগকে জটিল করে রেখেছে। এই শাস্ত্রের ওপর পড়াশুনা রয়েছে, এমন শিক্ষকও অনেক কম। যার ফলে দেখা যায়, কোনো শিক্ষার্থীকে এ বিষয়ে পড়তে বলা হলে সে প্রয়োজনীয় পাঠ্যবই সামনে না থাকার কারণে বিব্রতবোধ করে। এ প্রেক্ষাপটে আমি উদ্যোগ নিই যে, বিষয়টি সবার কাছে সহজবোধ্য করতে হবে। সেই উদ্যোগ বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে 'বুদ্ধিবৃত্তিক ক্রুসেডের মৌলনীতি' শিরোনামে এই শাস্ত্রের অতিগুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো সংক্ষেপে একমলাটে তুলে ধরছি। মূলত এ বইটি হলো এ বিষয়ে লিখিত ডজনখানেক গ্রন্থাবলির সারসংক্ষেপ। তবে এ বই রচনার সময় আমি ভারতীয় উপমহাদেশের প্রেক্ষাপটের প্রতি তুলনামূলক অত্যধিক নজর রেখেছি।

আশা করি, শিক্ষার্থীদের মননে এই শাস্ত্রের পরিভাষাগুলোর ছক গেথে দেওয়া সম্ভব হলে সে নিজস্ব অধ্যয়নের মাধ্যমে বিশদ বিস্তারিত আলোচনা বুঝে নিতে পারবে। এ বইটি পড়ানোর সময় সংশ্লিষ্ট শিক্ষক যদি আমার লেখা ثعابين الغزو الفكري ও ساحات الغزو الفكري সামনে রাখেন তাহলে ইনশাআল্লাহ সবকিছু সহজ-সাবলীল বোধ হবে। এ ছাড়া বইটির শেষাংশে আমি যেসব উৎস ও সহায়ক গ্রন্থাবলির তালিকা পেশ করেছি, সেগুলো পড়ে নিলে তিনি যেমন নিজেই আলোচিত বিষয়বস্তু বুঝবেন, তেমনি অন্যদেরও বোঝাতে সক্ষম হবেন। সেই গ্রন্থগুলোতে সংশ্লিষ্ট আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে প্রচুর উদাহরণ রয়েছে। ইসলামি সাংবাদিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য গণমাধ্যমে, বিশেষত সম্পাদকীয়তে যেসব প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও আলোচনা প্রকাশিত হয় সেগুলো পড়লেও দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তা-ভাবনা প্রসারিত হবে।

মহান আল্লাহর কাছে মিনতি করি— তিনি যেন অধমের এ প্রচেষ্টাকে সর্বমহলের কাছে গ্রহণযোগ্যতা দান করেন। দ্বীনি মাদরাসা ও আধুনিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে 'বুদ্ধিবৃত্তিক ক্রুসেড' পড়ানোর রেওয়াজ ব্যাপক করে দেন। ইনশাআল্লাহ, এর মাধ্যমে আমাদের শিক্ষার্থীরা চৈন্তিক, মতাদর্শিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক সবগুলো রণাঙ্গণে ইসলামের চৌকষ সক্ষম ও যোগ্য সৈনিক হিসেবে প্রমাণিত হতে পারবে।

মুহাম্মদ ইসমাঈল রায়হান

করাচি
২০ শাবান ১৪৩১ হি.
৩১ জুলাই ২০১০ ঈ.

বুদ্ধিবৃত্তিক ক্রুসেড

ভূমিকা

চিন্তাযুদ্ধ (Ideological War) পরিচিতি

পৃথিবীতে যুদ্ধ দু'ভাবে হয়। একটি হলো, সৈন্যবাহিনী, অস্ত্রশস্ত্র ও বিপদজনক হাতিয়ার সঙ্গে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়া। আরেকটি হলো এমন যুদ্ধ যেখানে কোনো ধরনের রক্তপাত হয় না; কিন্তু এ যুদ্ধের ধরন হলো, প্রতিপক্ষের বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গির ওপর আক্রমণ করা। যুদ্ধের এই দ্বিতীয় প্রকারটিকে الغزو الفكري বা চিন্তাযুদ্ধ বলা হয়।

চিন্তাযুদ্ধের সংজ্ঞা (Definition)

"هو الغزو بالوسائل الغير العسكرية"

'এটি এমন এক যুদ্ধ, যেখানে প্রচলিত যুদ্ধাস্ত্র ব্যবহার না করে অন্যান্য উপকরণ ও মাধ্যম ব্যবহার করে লড়াই করা হয়।'

আরেকটি সংজ্ঞা

"هو أسلوب جديد للغزو ضدّ المسلمين بعد هزائم متكررة"

'একের পর এক সামরিক যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্যে নতুন পদ্ধতি প্রয়োগ করা।'

চিন্তাযুদ্ধের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

ইসলামের শত্রুদের মূল লক্ষ্য হলো— মুসলিম জাতিসত্তাকে চৈন্তিক, মানসিক ও আনুভৌতিকভাবে হত্যা করে তাদেরকে নিজেদের কাঠামোতে গড়ে নেওয়া।

চিন্তাযুদ্ধ শাস্ত্র অধ্যয়নের উদ্দেশ্য

প্রাথমিক পর্যায়ে আমাদের লক্ষ্য হলো, নিজেদের আত্মরক্ষা করা। দ্বিতীয় পর্যায়ে আমাদের লক্ষ্য হবে, এমন সক্ষমতায় নিজেদের উত্তীর্ণ করা, যেন আমরা আমাদের সবগুলো প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে জবাবি কার্যক্রমও গ্রহণ করতে পারি।

চিন্তাযুদ্ধ শাস্ত্র (علم الغزو الفكري) এর সংজ্ঞা

এটি হলো এমন শাস্ত্র, যেখানে প্রতিপক্ষের চৈন্তিক ও আদর্শিক আক্রমণের সবগুলো পদ্ধতি গভীরভাবে নিরীক্ষণ করা হয়। এর মাধ্যমে নিজেদের প্রতিরক্ষার পরিকল্পনা গ্রহণ করা যায় এবং প্রতিপক্ষকে নিরুত্তর করতে সক্ষম হয়, এমন উত্তর প্রদানের পদ্ধতি চর্চা হয়।

চিন্তাযুদ্ধ শাস্ত্র (علم الغزو الفكري) এর আলোচ্য বিষয়

এ শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় হলো সেই মাধ্যম, মিডিয়া ও উপকরণ— যেগুলো ব্যবহার করে কোনো জাতির চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গি বদলে দেওয়া যায়।

চিন্তাযুদ্ধ শাস্ত্র (علم الغزو الفكري) এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য

এই শাস্ত্রের জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্য হলো— নিজস্ব বিশ্বাস, চিন্তাধারা, জাতিসত্তা এবং সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য নিরাপদ রেখে বিশ্বের অপরাপর জাতি-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের ওপর চৈন্তিক বিজয় ও আদর্শিক প্রাধান্য বিস্তার করা।

চিন্তাযুদ্ধ শাস্ত্র (علم الغزو الفكري) এর গুরুত্ব

বর্তমান যুগে সবগুলো বিশ্বশক্তি জোট বেঁধে নিজেদের সকল উপকরণ ও মাধ্যম ব্যবহার করে মুসলিমদের ওপর সামরিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক— উভয় রণাঙ্গনে আক্রমণ শানাচ্ছে। কাজেই মুসলিম জাতির জন্যে এই শাস্ত্রে দক্ষতা অর্জন করা ঠিক ততটুকুই জরুরি, যতটুকু জরুরি নিজেদের নিরাপত্তার জন্যে যুদ্ধাস্ত্র ও সৈন্যদলের বন্দোবস্ত রাখা।

সামরিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক যুদ্ধের মাঝে পার্থক্য

সামরিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক যুদ্ধের মাঝে বেশ কিছু পার্থক্য রয়েছে। যেমন—

* সামরিক যুদ্ধের মাঝে আক্রমণ হয় প্রতিপক্ষের শরীর, ভবন ও সামরিক স্থাপনাকে টার্গেট বানিয়ে। এর মাধ্যমে প্রতিপক্ষের স্রেফ বস্তুগত ক্ষতি হয়। এর বিপরীতে বুদ্ধিবৃত্তিক যুদ্ধের মাধ্যমে প্রতিপক্ষের মন-মানসিকতা, চিন্তাধারা ও ধ্যান-ধারণার ওপর আক্রমণ করা যায়। যার ফলে প্রতিপক্ষের যেমন ধর্মীয় ও দৃষ্টিভঙ্গিগত ক্ষয়-ক্ষতি হয়, তেমনই তাদের বস্তুগত ক্ষয়-ক্ষতিও সাধিত হয়।

বুঝা গেল, বুদ্ধিবৃত্তিক যুদ্ধ (الغـزو الفكـري) সামরিক যুদ্ধের চেয়ে বেশি প্রভাব ফেলে ও অত্যধিক ক্ষয়-ক্ষতি সাধন করে। এই বুদ্ধিবৃত্তিক যুদ্ধ নিঃসন্দেহে সামরিক যুদ্ধের চেয়ে অধিক কার্যকর।

বুদ্ধিবৃত্তিক যুদ্ধের ইতিহাস

تاريخ الغزو الفكري

History of Ideological war

হক-বাতিলের যুদ্ধ যতটা পুরনো, চৈন্তিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক যুদ্ধের ইতিহাসও তত পুরনো। আল্লাহর বান্দাদেরকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করার চক্রান্তের শুরু আদম আলাইহিস সালামের জন্ম থেকেই। যুগে যুগে নবি-রাসূলদের আহ্বানের বিরুদ্ধে তাঁদের শত্রুরা নানা ধরনের চৈন্তিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক যুদ্ধাস্ত্র ও হাতিয়ার ব্যবহার করেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রাসূল হিসেবে প্রেরীত হন তখন থেকেই হক-বাতিলের এই বিশেষ সংঘাত পৃথিবীর বুকে আরেকবার বিপরীতমুখী শক্ত অবস্থান নিয়ে মুখোমুখি হয়। মক্কি যুগে কাফেররা চিন্তাযুদ্ধের অংশ হিসেবে অনেকগুলো নিকৃষ্ট পদক্ষেপ নিয়েছিল। যেমন—

সবগুলো প্রতিপক্ষকে সঙ্গে নিয়ে পরামর্শ পরিষদ গঠন করা; ইসলামের বার্তা সম্পর্কে জনমনে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি করা; নানাভাবে অপব্যাখ্যার আশ্রয় নেওয়া; মিথ্যা প্রোপাগান্ডা ছড়ানো; বিদ্রূপ ও তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা; বাজে উপাধী দিয়ে প্রচার করা; মনোবল ভেঙ্গে দেওয়ার মত বয়ান-বিবৃতি দেওয়া; হাস্যকর ও উদ্ভট দাবি-দাওয়া পেশ করা; মুসলিমদেরকে চৈন্তিক ও শারীরিকভাবে কষ্ট দেওয়া; গোত্রীয় প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তার করে চাপে ফেলা; হুমকি-ধমকি দেওয়া; নেতৃত্ব, সম্পদ, বিত্ত ও সুন্দরী নারীর প্রস্তাব দিয়ে লোভ দেখানো; অবস্থান থেকে সরে এসে সমাঝোতার প্রস্তাব দেওয়া; সামাজিকভাবে বয়কট করা; অপপ্রচার করা; শোরগোল সৃষ্টি করা ও দেশান্তর করা।

আপনি লক্ষ্য করুন, প্রতিটি যুগেই বাতিল গোষ্ঠী ধোঁকা, প্রতারণা ও কষ্ট দেওয়ার ওই পদ্ধতিগুলোকেই নতুন নতুন অবয়বে প্রয়োগ করে আসছে। প্রতিপক্ষের এধরনের বুদ্ধিবৃত্তিক ও চৈন্তিক আক্রমণের বিরুদ্ধে মুসলিমরা

মক্কি যুগে জবাবি ও প্রতিরোধমূলক কর্মসূচি হিসেবে তিন ধরনের পদক্ষেপ নিতো—

১. আল্লাহর সঙ্গে নিবীড় সম্পর্ক গড়া।
২. আল্লাহর সৃষ্টিজীবের কল্যাণ কামনা করা।
৩. জ্ঞান ও কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি করে নিজেকে প্রশিক্ষিত করা।

মাদানি যুগে কাফেরদের পক্ষ থেকে চার ধরনের বুদ্ধিবৃত্তিক যুদ্ধের নজির ও প্রমাণ পাওয়া যায়—

১. ওই যুগের প্রচারমাধ্যম ছিল কবিতা ও বয়ান। এই মাধ্যমগুলোকে তারা বুদ্ধিবৃত্তিক যুদ্ধের কাজে ব্যবহার করতো।
২. তর্ক-বিতণ্ডা করা।
৩. মুনাফেকি বা ভণ্ডামি-দ্বিচারিতা করা।
৪. গুপ্তচরবৃত্তি করা।

এ সময় প্রতিপক্ষ যে অবয়বে আক্রমণ করেছে, মুসলিমরা সেই আক্রমণের জবাব সে অবয়বে দিতে সামান্যতম কসুরও করেননি।

রাশেদার যুগে বুদ্ধিবৃত্তিক যুদ্ধ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইনতিকালের পরপরই ইসলামের বিরুদ্ধে চৈন্তিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক যুদ্ধ তীব্রতা লাভ করে। সাইয়্যেদুনা আবু বকর সিদ্দিক রযি. সেই প্রেক্ষাপটে দৃঢ়তা, আল্লাহনির্ভরতা ও ঈমানি প্রত্যয়ের বিস্ময়কর নজির স্থাপন করে খুবই অল্প সময়ের ভেতর সেই ফেতনাগুলো সমূলে নির্মূল করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

সাইয়্যেদুনা উমর ফারুক রদি.-এর যুগে ইসলামের শত্রুরা কোনো ময়দানেই অগ্রসর হতে পারেনি। তাঁর শাহাদাতের পর শুরু হয় সাইয়্যেদুনা উসমান ইবনুল আফ্ফান রদি.-এর যুগ। তাঁর শাসনামলে অগ্নিপূজারী গোষ্ঠীদের সঙ্গে ইহুদিরা জোট বেঁধে ময়দানে নেমে আসে। যার পরিণতিতে উসমান রদি.-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দানা বাধতে শুরু করে। বিভ্রান্ত পথচ্যুত কিছু লোকের আক্রমণে তিনিও শাহাদাত বরণ করেন। এদেরই চক্রান্তে সাইয়্যেদুনা আলি রদি.-এর যুগে জঙ্গে জামাল

ও জঙ্গে সিফফিনের অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটে। হযরত আলি রদি.-এর সুযোগ্য উত্তরসূরি হযরত হাসান রদি.-এর প্রখর বুদ্ধিমত্তার বদৌলতে ওই যুগের মুসলিম উম্মাহ পুনরায় একক খলিফা সাইয়্যেদুনা আমিরে মুআবিয়া রদি.-এর শাসনাতলে একত্র হন। শুরু হয় ইসলামের বিজয় মিছিলের নতুন ইতিহাস।

উমাইয়া ও আব্বাসি শাসনামলে বুদ্ধিবৃত্তিক যুদ্ধ

আমির মুআবিয়া রদি.এর ইনতিকালের পর সাইয়্যেদুনা হুসাইন রদি.-কে কারবালা প্রান্তরে চক্রান্তের সূতোয় টেনে এনে শহিদ করা হয়। ভয়াবহ গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে মুসলিম উম্মাহ। উমাইয়া যুগে কুরআন কারিম ও হাদিসে রাসূলের ব্যাপারে খ্রিস্টান পাদরিদের নানা আপত্তি-প্রশ্ন উঠতে শুরু করে; কিন্তু তাদের সেসকল সংশয়পূর্ণ কথার কারণে ওই যুগের মুসলমান কখনই প্রভাবিত হননি।

আব্বাসি শাসনামলে শুরু হয় শারঈ শাস্ত্রগুলোর ওপর বুদ্ধিবৃত্তিক শাস্ত্রীয় আক্রমণ। খলিফা মামুন দর্শন শাস্ত্রের বই-পুস্তক গ্রিকভাষা থেকে অনুবাদ করিয়ে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় প্রচার শুরু করে দেয়। যার ফলে মুসলিম জ্ঞানীদের একটি বিশাল অংশ গ্রিকদর্শনের শিকার হয়ে পথচ্যুত হয়ে পড়ে। সেখান থেকেই জন্ম নেয় মু'তাযিলা ফিরকা। কিন্তু ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, ইমাম আবুল হাসান আশআরি ও ইমাম গাযালি রহ.-এর মত মহামনীষীগণ দক্ষতা ও বীরত্বের সঙ্গে এ সকল ফিতনার প্রতিরোধে দাঁড়িয়ে যান। বুদ্ধিপূজারী গোষ্ঠী তাঁদের কাছে পরাজিত হয়ে রণেভঙ্গ দিয়ে সটকে পড়ে।

ওই যুগে বুদ্ধিবৃত্তিক আক্রমণকারীদের ব্যর্থতার কারণ

ইতিহাসের পাতা মেললে দেখা যায়— এই দীর্ঘ সময়ে যারা ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়েছিল, তারা সফলতার মুখ দেখতে পায়নি। কী কারণে মুসলিম উম্মাহর কাছে তাদের শোচনীয় পরাজয় বরণ করতে হয়েছিল, তার খতিয়ান দেখলে কিছু কারণ উঠে আসে। কারণগুলো হলো—

১. আল্লাহ, রাসূল ও কুরআন-সুন্নাহর সঙ্গে মুসলিমদের সম্পর্ক খুবই প্রগাঢ় ছিল।

২. বুদ্ধিবৃত্তিক আক্রমণকারীরা জ্ঞানগত বিচারে দুর্বল ছিল। এর বিপরীতে মুসলিম উম্মাহ ছিল গভীর জ্ঞানের অধিকারী।

৩. তৎকালীন বিশ্বে মুসলিম উম্মাহ রাজনৈতিকভাবে পরাক্রম ছিল।

৪. ওই যুগে খোদ মুসলিম শাসকবর্গ দ্বীনি আত্মমর্যাদাবোধের অধিকারী ছিলেন। নিজের দ্বীন ও ঈমানের ব্যাপারে তারা সজাগ ও সতর্ক অনুভূতির অধিকারী ছিলেন।

৫. প্রায়সময় মুসলিমদের আচরণ ও কৃতিত্ব দেখে প্রভাবিত হয়ে খোদ আক্রমণকারী ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়ে নিজেকে সৌভাগ্যবান করতো।

ক্রুসেড যুদ্ধ

الحروب الصليبيه

(Crusade)

বর্তমানে যেই বুদ্ধিবৃত্তিক ক্রুসেড চলছে, এর শেকড় অনুসন্ধান করলে দেখা যায়— হিজরি পঞ্চম শতাব্দী অর্থাৎ ঈসায়ি একবিংশ শতাব্দীতে যেই ক্রুসেড যুদ্ধ শুরু হয়েছিল, সেখান থেকেই এর উৎপত্তি।

ক্রুসেডের সংজ্ঞা

"الحروب الصليبية التي دعا إليها رجال دين النصارى والقساوسة ضد المسلمين باسم الصليب وتحت رايته".

ক্রুসেড যুদ্ধ বলা হয়, 'যেই যুদ্ধগুলোর ডাক দিয়েছিল খ্রিস্টধর্মের ধর্মগুরু ও পুরোহিতরা। মুসলিমদের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধগুলো সংঘটিত হয় ক্রুশের পতাকাতলে, ক্রুশের সম্মান রক্ষার নাম নিয়ে'।

যুগে যুগে ক্রুসেড যুদ্ধ

এই যুদ্ধগুলো সংঘবদ্ধভাবে প্রথম শুরু হয় হিজরি ৪৮৯ সালে। পুরো দু' শতাব্দী অব্যাহত থেকে এর প্রথমপর্ব শেষ হয় হিজরি ৬৯০ সালে।

ক্রুসেড যুদ্ধের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য

ইউরোপিয়ান নেতৃবৃন্দ এই যুদ্ধগুলো পরিচালিত করেছিল নির্দিষ্ট কিছু লক্ষ্য নিয়ে। তন্মধ্য হতে কিছু প্রধান লক্ষ্য হলো—

১. এশিয়ার মুসলিম রাষ্ট্রগুলো দখল করা।

২. আল-কুদস পুনরুদ্ধার করা।

৩. মুসলিমদের কাছ থেকে বিগত শতাব্দীগুলোর পরাজয়ের প্রতিশোধ নেওয়া।

খ্রিস্টান পাদরিরা স্বজাতিকে উত্তেজিত করার জন্যে এই প্রোপাগান্ডা ছড়াতো যে, মুসলমানরা বাইতুল মাকদিসে আমাদের পবিত্র স্থাপনাগুলোর অসম্মান করছে। ইউরোপিয়ান পর্যটকদের ওপর অত্যাচার করছে। পুরোহিত *পিটার্স* আল-কুদস পরিদর্শন করে ইউরোপে ফিরে অগ্নিঝরা ভাষণ দিতে থাকে। তার অণলবর্ষী ভাষণ শুনে গোটা ইউরোপে আগুনের লেলিহান শিখা ছড়িয়ে পড়ে। ১৫ আগস্ট ১০৮৫ ঈসাব্দে ভেনিস (Venice) থেকে পোপ আরবান প্রথম ক্রুসেড যুদ্ধের ঘোষণা জানায়।

প্রথম ক্রুসেড যুদ্ধ

দশ লক্ষ ক্রুসেডার ফ্রান্সের রাজা গডফ্রের নেতৃত্বে শাবান ৪৯২ হিজরি মুতাবেক জুলাই ১০৯৯ ঈসাব্দে পুণ্যভূমি আল-আকসার ওপর ক্রুশখচিত পতাকা উড়িয়ে দেয়। সেদিন মসজিদুল আকসার সম্মান রক্ষার্থে ৭০ হাজার মুসলমান বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়ে শাহাদাতের পেয়ালায় চুমু খেয়েছিলেন। যাদের রক্তের স্রোতধারার নিচে বিজয়ী খ্রিস্টান ক্রুসেডারদের ঘোড়াগুলো হাঁটু অবধি ডুবে গিয়েছিল।

ইমাদুদ্দিন যানকি

বাইতুল মাকদিস পতনের ২৬ বছর পর ৫১৮ হিজরি, মুতাবেক ১১২৪ ঈসাব্দে *ইমাদুদ্দিন যানকি* নামের একজন অখ্যাত সেপাই *ওয়াসেত* ও *বসরা* নগরীর জমিদারি লাভ করে। তিনি একের পর এক বিজয়কেতন উড্ডয়নের মাধ্যমে ক্রুসেডারশিবিরে প্রবল ভীতি ছড়িয়ে দেন। তাদের সম্মিলিত শক্তির ওপর তাঁর প্রতিটি আঘাত অত্যন্ত গভীরে ফাটল ধরিয়ে দিতে সক্ষম হয়।

নূরুদ্দিন যানকি ও দ্বিতীয় ক্রুসেড যুদ্ধ

ইমামুদ্দিন যানকির ছেলে *সুলতান নুরুদ্দিন যানকি* পিতার ইনতিকালের পর বিজয়কেতন উড্ডীন রাখার এই দুর্লঙ্ঘ্য মিশনের হাল ধরেন। তাঁর নেতৃত্বে জিহাদি কাফেলা অনেক দূর অগ্রসর হয়। যানকি পরিবারের

বিজয়ধারা প্রতিহত করার জন্যে নতুন করে ক্রুসেডের দাবানল জ্বলে ওঠে। ৫৪২ হিজরি, মুতাবেক ১১৪৮ ঈসাব্দে কয়েক লাখ জার্মান ও ফরাসি সিপাহি *সেন্ট বার্নার্ড লুই* সপ্তমের নেতৃত্বে বৃহত্তর শামদেশের ওপর আক্রমণ করে; কিন্তু ৫৪৪ হিজরি, মুতাবেক ১১৪৯ ঈসাব্দে ভীত-সন্ত্রস্থ হয়ে পিছিয়ে আসে।

সুলতান সালাহউদ্দিন আইউবি ও তৃতীয় ক্রুসেড যুদ্ধ

সুলতান সালাহউদ্দিন আইউবি মিসর ও শামদেশ যোগীভূত করার পর রবিউস সানি ৫৮৩ হিজরিতে হিত্তিনের ঐতিহাসিক রণাঙ্গনে খ্রিস্টানদের শক্তি নিঃশেষ করে দেন। ২৭ রজব ৫৮৩ হিজরি, মুতাবেক সেপ্টেম্বর ১১৮৭ ঈসাব্দে তিনি বাইতুল মাকদিস জয় করেন। যার ফলে ইউরোপিয়ান দেশগুলো ৫৮৫ হিজরি, মুতাবেক ১১৮৯ ঈসাব্দে ফিলিস্তিনের ওপর আক্রমণ করে। এই তৃতীয় ক্রুসেড যুদ্ধ চারবছর অব্যাহত থাকে। শাবান ৫৮৮ হিজরি, সেপ্টেম্বর ১১৯২ ঈসাব্দে ক্রুসেডাররা পরাজিত হয়ে ব্যর্থ মনোরথে ফিরে যায়।

চতুর্থ ক্রুসেড যুদ্ধ

জার্মান রাজা *ষষ্ঠ হেনরি* চতুর্থ ক্রুসেড যুদ্ধের ডাক দেয়। ৫৯১ হিজরি, মুতাবেক ১১৯৫ ঈসাব্দে বৃহত্তর শামদেশের ওপর আক্রমণ করে; কিন্তু মাঝপথে লোকটির মৃত্যু ঘটলে তার এই অভিযানও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

পঞ্চম ক্রুসেড যুদ্ধ

৬১৮ হিজরি, মুতাবেক ১২২১ ঈসাব্দে পুনরায় ক্রুসেডের দাবানল জ্বলে ওঠে। তখন সুলতান সালাহউদ্দিন আইউবির ভ্রাতুষ্পুত্রগণ সম্মিলিত হয়ে জোট বেঁধে একের পর এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে ক্রুসেডারদের মুখে শোচনীয় পরাজয়ের চুনকালি মেখে দেন।

ষষ্ঠ ক্রুসেড যুদ্ধ ও জার্মানদের হাকে কুদসের পতন

ষষ্ঠ ক্রুসেড যুদ্ধ ৬২৪ হিজরি, মুতাবেক ১২২৮ ঈসাব্দে শুরু হয়। এই যুদ্ধে জার্মান রাজা *ফ্রেডরিক* দ্বিতীয়ের নেতৃত্বে ক্রুসেডাররা সংঘবদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে মুসলিমরা পিছিয়ে আসতে বাধ্য হয়। তখন একটি বিশেষ চুক্তির অধীনের নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্যে 'আল-কুদস' জার্মানদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। ৬৪২ হিজরি, মুতাবেক ১২৪৪ ঈসাব্দে 'আল-মালিকুস সলেহ' খাওয়ারজেমি সৈন্যদের সঙ্গে নিয়ে সুলতান আইউবির আমানত 'আল-কুদস' পুনরুদ্ধার করে মুসলিমদের হাতে অর্পণ করেন।

সুলতান বাইবার্স ও সপ্তম ক্রুসেড যুদ্ধ

ফরাসি রাজা *সেন্ট লুইস* রোমের প্রধান পুরোহিতের আহ্বানে ১২৪৮ ঈসাব্দে সপ্তম ক্রুসেড যুদ্ধের ডাক দেয়। তারা ২ মুহাররম ৬৪৮ হিজরি, মুতাবেক ৬ এপ্রিল ১২৫০ ঈসাব্দে 'মানসুরাহ' নগরীতে পরাজিত হয়। যুদ্ধবন্দি হিসেবে সেন্ট লুইস ধৃত হয়। চার বছরের বন্দিজীবন শেষে তাকে স্বদেশে ফেরত পাঠানো হয়।

অষ্টম ক্রুসেড যুদ্ধ

আঠারো বছর পর ৬৬৮ হিজরি, মুতাবেক জুলাই ১২৭০ ঈসাব্দে সেন্ট লুইস পুনরায় আক্রমণ করে বসে; কিন্তু অবরোধ চলাকালে সে অসুস্থ হয়ে পড়ায় নিরুপায় হয়ে ক্রুসেডের ইতি টানতে বাধ্য হয়। ৬৯০ হিজরি, মুতাবেক ১২৯১ ঈসাব্দে মিসরসম্রাট 'আল-মালিকুল খলিল' পুরো বৃহত্তর শামদেশ থেকে খ্রিস্টান রাজ্যগুলোর স্থায়ী উচ্ছেদ করেন। যার ফলে হিজরি পঞ্চম শতাব্দীতে সূচিত ক্রুসেডের সর্বশেষ নাম-নিশানাও মাটির সঙ্গে মিশে যায়।

সেন্ট লুইস— ইউরোপে বুদ্ধিবৃত্তিক ক্রুসেডের প্রতিষ্ঠাতা

সেন্ট লুইস যখন মৃত্যুর আগে দেখতে পায় যে, একের পর এক রণাঙ্গনে তার সৈন্যরা মুসলিমদের হাতে শোচনীয় পরাজয়ের শিকার হচ্ছে তখন সে অনেক চিন্তা–ভাবনা করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, মুসলিমদের

পরাজিত করতে হলে সর্বাগ্রে তাদের ওপর বুদ্ধিবৃত্তিক আক্রমণ করতে হবে। এ জন্যে ইউরোপিয়ানদের সবার আগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ময়দানে উন্নতি করে সার্বিক প্রস্তুতি নিতে হবে। এটা খুবই জরুরি। সেন্ট লুইস মৃত্যুর আগে তার উইলের মাঝে মুসলিমদের বিরুদ্ধে সফলতা পেতে চারটি সুপারিশ পেশ করে—

১. মুসলিম শাসকদের মাঝে অনৈক্য সৃষ্টি করতে হবে।
২. তাদের মাঝে পোক্ত আকিদা ও মজবুত ঈমানওয়ালা কোনো গোষ্ঠীকে মাথা তুলে দাঁড়াতে দেওয়া যাবে না।
৩. মুসলিম সমাজকে অশ্লীলতা, চারিত্রিক পতন ও অর্থনৈতিক দুর্নীতির মাধ্যমে দুর্বল করে ফেলতে হবে।
৪. গাজা (Gaza) থেকে আন্তাকিয়া (Antakya) পর্যন্ত একটি বিস্তৃত সম্মিলিত ইউরোপিয়ান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে। (এ অঞ্চলটি হচ্ছে বর্তমান ফিলিস্তিন, ইসরাইল ও শামদেশ।)

ক্রুসেড যুদ্ধগুলোর পরিণতিতে ইউরোপের চিন্তা-ভাবনার মাঝে ব্যাপক পরিবর্তন আসে। তারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে বুদ্ধিবৃত্তিক রণাঙ্গণে লড়াই করার জন্যে জ্ঞানগত হাতিয়ার তৈরির কাজ শুরু করে দেয়। এভাবেই সূচিত হয় বুদ্ধিবৃত্তিক ক্রুসেডের নতুন অধ্যায়।

প্রথম অধ্যায়
চৈন্তিক ও মতাদর্শিক যুদ্ধের রণাঙ্গন
ساحات الغزو الفكري
(Fields of Ideological War)

১. الاستشراق : [আল-ইসতিশ্‌রাক] ওরিয়েন্টালিজম/প্রাচ্যতত্ত্ব
২. الاستعمار : [আল-ইসতি'মার] বা সাম্রাজ্যবাদ
৩. العولمة : [আল-আওলামা] বা বিশ্বায়ন
৪. الردّة \ التنصير : [আত-তান্‌সির/আর-রিদ্দাহ] খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করণ বা ধর্মচ্যুত করা

বুদ্ধিবৃত্তিক ক্রুসেডের প্রথম ক্ষেত্র

الإستشراق [আল ইসতিশরাক]

ওরিয়েন্টালিজম (Orientalism) / প্রাচ্যতত্ত্ব

শাব্দিক অর্থ

إستشراق [ইসতিশরাক] শব্দটি شرق [শারক্বুন] থেকে নির্গত। شرق [শারক্বুন] Orient [ওরিয়েন্ট] বলে বোঝানো হয় ওই অঞ্চলগুলোকে যেখানে সূর্য সর্বাগ্রে উদিত হয়। পরবর্তীকালে এ শব্দটির মাধ্যমে 'প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশের জ্ঞান-সাহিত্য সম্পর্কিত গবেষণা' বোঝানো হয়।

ইউরোপিয়ানদের কাছে مشرق [মাশরিক] শব্দটি দুটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। প্রথম অর্থের ভিত্তিতে তারা মাশরিক বলতে বোঝায় ওই সকল অঞ্চলকে, যা ইউরোপের পূবদিকে অবস্থিত। এই অর্থে, এই ব্যঞ্জনায় এশিয়ার সবগুলো রাষ্ট্র এর অন্তর্ভুক্ত।

দ্বিতীয় অর্থে তারা রোমসাগরের ওপারের অঞ্চলগুলোকে مشرق [মাশরিক] বলে। তখন কেমনযেন এশিয়া ছাড়াও ইউরোপের পূবদিকে অবস্থিত আফ্রিকা মহাদেশও এর ভাবার্থের মাঝে ঢুকে পড়ে।

ইসতিশরাক [ওরিয়েন্টালিজম] এর সংজ্ঞা (Definition)

আরব পণ্ডিতগণ إستشراق [ইসতিশরাক] এর সংজ্ঞা এভাবে দিয়েছেন—

"دِرَاسَةُ الْغَربيينَ لِلشَّرْقِ الإِسْلَامِيّ حَضَارَتَهُ وَاَدِيانَهُ وَآدَابَهُ وَلُغَاتَهُ وتَارِيْخَهُ وَثَقَافَتَهُ وَعَادَاتِه."

'পশ্চিমা কর্তৃক প্রাচ্যীয় ইসলামিজাহানের সংস্কৃতি, ধর্মমত, সাহিত্য, ভাষা, ইতিহাস, সভ্যতা ও রীতি-নীতি অধ্যয়ন করা।'

المستشرق [আল-মুসতাশরিক]

ওরিয়েন্টালিস্ট (Orientalist) / প্রাচ্যবিদ

যারা এভাবে প্রাচ্য নিয়ে গবেষণা করে তাদেরকে المستشرق [আল-মুস্তাশ্‌রিক] ওরিয়েন্টালিস্ট (Orientalist) / প্রাচ্যবিদ বলা হয়।

المستشرق [আল-মুসতাশরিক] হলো ওই সকল পশ্চিমা বুদ্ধিজীবি, যারা ধর্মীয় উগ্রতার শিকার হয়ে বিভিন্ন ইসলামিশাস্ত্র গভীর অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করে। উদ্দেশ্য হলো, ইসলামি উৎসের মাঝে সংমিশ্রণ ছড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমে ইসলামের প্রাণশক্তি দুর্বল করা এবং সেগুলোর আকার-অবয়বের মাঝে বিকৃতি ঘটানোর মাধ্যমে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রশ্নবিদ্ধ করা।

ইসতিশরাকের ইতিহাস (Histoy of Orientalism)

ইসতিশরাকের ইতিহাসকে আমরা চারটি ভিন্ন যুগে ভাগ করে দেখতে পারি।

প্রথম যুগ : ১ লা হি. থেকে ৭০০ হি. পর্যন্ত

এ যুগটি শুরু হয়েছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মদিনা হিজরত থেকে। আর শেষ হয়েছে ক্রুসেড যুদ্ধগুলো শেষ হওয়ার সময়কালে। রাশেদার যুগ ও উমাভি যুগে ইহুদি পণ্ডিত ও খ্রিস্টান পাদরিদের তরফ থেকে অনুচ্চ স্বরে, মৃদু গলায় ইসলামের ওপর নানাবিধ আপত্তির ধারাবাহিকতা শুরু হয়; কিন্তু তাদের এই অপপ্রয়াস ওই যুগের মুসলিমদের ওপর কখনই প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়নি। ওই যুগে অমুসলিমরা চিকিৎসা, ক্যামেস্ট্রি, গণিত, কৃষি ও ভাষা-সাহিত্যের মত শাস্ত্রগুলোতে মুসলিমদের শিষ্যত্ব বরণ করতো। ইসলামি জাহানের অজস্র সুচয়িত গ্রন্থ ইউরোপের বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়। ইবনে আলি সিনা, জাবির ইবনে হাইয়্যান, আল-ফারাবি ও ইবনে রুশদের গ্রন্থগুলো স্থানীয় বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হতে থাকে। ওই যুগেই সর্বপ্রথম ফ্রান্স, বৃটেন, ইটালি ও স্পেনে বিশ্ববিদ্যালয়ের গোড়াপত্তন হয়। সেখানে

খ্রিস্টধর্মের পাশাপাশি সংবিধান, চিকিৎসা ও শিল্পকলার বিবিধ শাস্ত্রের উচ্চশিক্ষা দেওয়া হতো।

দ্বিতীয় যুগ : ১৩০০ ঈ. থেকে ১৮০০ ঈ. পর্যন্ত

নবম লুইসের চিন্তাধারা থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে ইউরোপে জাগরণ সৃষ্টি হয়। তখনকার পণ্ডিতগণ ও জাতির কর্ণধার ব্যক্তিত্ববর্গ জ্ঞান-বিজ্ঞানের জগতে বিদ্যমান জড়তা দূর করার সিদ্ধান্ত নেয়।

ক্রুসেড যুদ্ধের ধারাবাহিকতা শেষে ১৩১২ ঈসাব্দে ইউরোপের পণ্ডিত ও বুদ্ধিজীবিরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, স্থানীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রাচ্যের বিভিন্ন শাস্ত্র অন্তর্ভুক্ত করা হবে। সেই সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে পাঁচটি ইউরোপিয়ান ইউনিভার্সিটিতে আরবি ও ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষাদান শুরু হয়। ঈসায়ি পঞ্চদশ ও ষষ্ঠদশ শতাব্দীতে ইসতিশরাকের পরিধি গোটা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। ঈসায়ি সপ্তদশ শতাব্দীতে ফরাসি রাজা লুই *চতুর্দশ* ওরিয়েন্টালিস্টদের মাধ্যমে আরবি গ্রন্থগুলো স্থানীয় ভাষায় অনুবাদ করান। তিনি এ সময় আরবজাতির ইতিহাসের ওপর এমন কিছু গ্রন্থ রচনা করান, যেখানে আরব জাতীয়তাবাদের ওপর উৎসাহ দেওয়া হয়েছে।

এই যুগের কিছু ওরিয়েন্টালিস্ট পূর্বের ওরিয়েন্টালিস্টদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের সমালোচনাও করেছে। ইসলামধর্ম সম্পর্কে তারা পূর্ববর্তীদের সংশয়গুলোকে দুর্বল প্রতিপন্ন করার পাশাপাশি নিজেদের পক্ষ থেকে ইসলামের ওপর অনেকগুলো নতুন আপত্তি জুড়ে দেয়।

তৃতীয় যুগ : ১৮০১ ঈ. থেকে ১৯২৪ ঈ. পর্যন্ত

ইস্তিশ্‌রাকের তৃতীয় যুগটি হলো ইতিহাসের সেই সময়কাল, যখন ইউরোপিয়ান সৈন্যবাহিনী একের পর এক মুসলিমরাষ্ট্র করতলগত করছিল। ওই সময় ওরিয়েন্টালিস্টরা ইউরোপিয়ান রাজনীতিবিদদেরকে অধীনস্থ জাতি-গোষ্ঠীগুলোর জ্ঞান-বিজ্ঞান, ইতিহাস, জিয়োগ্রাফি, কবিতা, সাহিত্য ও শিক্ষা-সংস্কৃতির যাবতীয় তথ্য সতর্কতার সঙ্গে সরবরাহ করতো। উদ্দেশ্য হলো, যেন তাদেরকে চিরকাল অধীনস্থ বানিয়ে রাখা

যায়। তারা ইসলামের ইতিহাসের স্থলে আরব জাতির ইতিহাসের সঙ্গে সবাইকে পরিচিত করিয়ে দেয়। অনারব বিশেষত তুর্কিদের চরিত্র নিয়ে টানা-হেঁচড়া শুরু করে। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যারা অস্ত্র ধারণ করেছে, সেই মুজাহিদ নেতৃবৃন্দের চরিত্রে কালেমা লেপন করতে থাকে। হাদিস ও হাদিসের বর্ণনাকারীদের ওপর আক্রমণ বাঁধিয়ে দেয়। ইসলামি জাহানের বিভিন্ন ফেরকার মাঝে বিদ্যমান বিদ্বেষের আগুন আরো উস্কে দিতে থাকে। এ কাজগুলো সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্যে তারা হাজার হাজার ইসলামি গ্রন্থ ইউরোপের সবগুলো প্রসিদ্ধ ভাষায় অনুবাদ করে।

ওরিয়েন্টালিস্টরা এমন কিছু প্রতিপাদ্যের ওপরও কাজ করেছে, যেগুলোর ব্যাপারে মুসলিম স্কলারগণ প্রশংসা করেছেন। তারা দুষ্প্রাপ্য ইসলামি পাণ্ডুলিপি সন্ধান করে, সংশোধিত অবয়বে, নতুন করে মুদ্রণ করেছে। কিন্তু এর পাশাপাশি তারা অসংখ্য অগণিত পাণ্ডুলিপি মুসলিম জাহান, বিশেষত আরবের বিভিন্ন রাষ্ট্রের জনগণ থেকে ক্রয় করে, লুটতরাজ করে, গ্রন্থাগার থেকে চুরি করে ইউরোপে পাচার করেছে।

চতুর্থ যুগ : ১৯২৫ ঈ. থেকে ১৯৭২ ঈ. পর্যন্ত

চতুর্থ যুগে শুরু হয় নতুন ধরনের আক্রমণ। এ সময় ওরিয়েন্টালিস্টরা ইসলামের ওপর আপত্তি তুলে সেটিকে দুর্বল ও ভিত্তিহীন প্রমাণিত করার অপপ্রয়াস ছড়িয়ে দিয়ে একটি নয়া ইসলামের ভিত্তিপ্রস্থর স্থাপন করতে মরিয়া হয়ে ওঠে। তারা চেয়েছিল— ইসলামের ইচ্ছামাফিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে এমন একটি নয়া ইসলাম জন্ম দিতে, যা পশ্চিমা বিশ্বের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে। ওরিয়েন্টালিস্টদের কর্মপদ্ধতির মাঝে এত বড় পরিবর্তন আসার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো, ওই সময় কমিউনিজম আত্মপ্রকাশ করেছিল। কমিউনিজমের আত্মপ্রকাশের কারণে ইউরোপিয়ান ওরিয়েন্টালিস্ট মহল নিজেদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য কিছু সময়ের জন্যে পরিবর্তন করার সিদ্ধান্ত নেয়।

পঞ্চম যুগ : ১৯৭৩ ঈ. থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত

ওই সময় পশ্চিমারা সারা বিশ্বকে সামনে রেখে এমন কিছু পরিকল্পনা গ্রহণ করে, যার সামনে খোদ প্রাচ্যতত্ত্বের কনসেপ্ট বেশ ক্ষুদ্র

দেখাচ্ছিল। এজন্যে তারা ১৯৭৩ সালে প্যারিসে অনুষ্ঠিত একটি কনফারেন্সে ওরিয়েন্টালিজমের পরিভাষা ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এর স্থলে তারা গ্লোবালাইজেশন (Globalization)/বিশ্বায়ন-এর নতুন পরিভাষা সম্পর্কে সবাইকে অবহিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

মার্কিন প্রাচ্যতত্ত্ব

এ সময় প্রাচ্যতত্ত্বের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে মার্কিন ওরিয়েন্টালিজম। তাদের পথনির্দেশনায় প্রাচ্যতত্ত্বের কার্যক্রম নতুন ধারায় চলতে শুরু করে। বিশেষত ১১ সেপ্টেম্বর ২০০১ ঈসাব্দের পর প্রাচ্যতত্ত্বের পুরো বাগডোর শতভাগ আমেরিকার হাতে চলে যায়। মিশনারি থেকে শুরু করে ফ্রি ম্যাসনরি পর্যন্ত, ইসলামবিকৃতির সবগুলো হাতিয়ার ওরিয়েন্টালিস্টদের পূর্ণ সহায়তা পেয়ে পরিচালিত হচ্ছে।

ইস্‌তিশ্‌রাকের কার্যক্রমের ধরন

ওরিয়েন্টালিস্টদের গবেষণা ও কার্যক্রম তিনটি স্তরে সম্পন্ন হয়ে থাকে—

১. مرحلة الاستكشاف : আবিস্কার ও গবেষণার স্তর

এই স্তরে ওরিয়েন্টালিস্ট মহল যেই তথ্য সরবরাহ করে সেখানে বাহ্যিকভাবে গবেষণা, আবিস্কার ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচার-প্রসারের মনোবৃত্তি প্রকাশ পেয়ে থাকে। এ সময় তাদের লেখালেখির মাঝে মুসলমান বা প্রাচ্য সম্পর্কে কোনো ধরনের বিদ্বেষ দেখা যায় না। এই স্তরের গবেষণাকার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে তারা পাঠকদের মন তাদের গবেষণাকর্মের প্রতি আকৃষ্ট করে থাকে।

২. مرحلة المختلطة : সংমিশ্রণের স্তর

এ ধরনের কার্যক্রমে যে কাজগুলো ওরিয়েন্টালিস্টদের ঘরানায় সম্পন্ন হয় সেই গবেষণা ও রচনাবলির মাঝে তারা বেশ মৃদু কণ্ঠে, অনুচ্চ শব্দে ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎস ও ইসলামি ব্যক্তিত্বের প্রতি জনগণের ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রশ্নবিদ্ধ করার অপচেষ্টা চালায়।

৩. مرحلة العدوان الواضح : স্পষ্ট ইসলামবিদ্বেষ

এই স্তরে এসে তারা ইসলামের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্বেষে অবতীর্ণ হয়। ওরিয়েন্টালিস্টরা তখন ইসলামের আকিদা-বিশ্বাস ও শরিয়াতে মুহাম্মাদি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর নির্জলা তোপ দাগাতে থাকে। এ সময় তারা মানবতার অগ্রদূত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবায়ে কেরাম রদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম ও ইসলামের বিভিন্ন প্রতীক নিয়ে অবলীলায় বিদ্রূপ করে বেড়ায়।

প্রাচ্য নিয়ে চর্চার প্রেরণা শক্তি

ওরিয়েন্টালিস্টদের এ সব কর্মকাণ্ডে পাঁচটি শক্তি প্রেরণা যুগিয়ে থাকে—

১. ক্রুসেডীয় প্রেরণা শক্তি
২. রাজনৈতিক ও সাম্রাজ্যবাদী প্রেরণা শক্তি
৩. প্রতিরক্ষামূলক প্রেরণা শক্তি
৪. বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক প্রেরণা শক্তি
৫. জ্ঞান-বিজ্ঞান কেন্দ্রিক প্রেরণা শক্তি

ক্রুসেডীয় প্রেরণা শক্তি

ওরিয়েন্টালিস্ট মহল ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা ও জাতিগত আবেগ-উদ্দীপনার ভিত্তিতে প্রাচ্যতত্ত্বকে ইসলামের বিরুদ্ধে একটি হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে থাকে। তারা সবসময় খ্রিস্টবাদকে পৃথিবীর বুকে শ্রেষ্ঠধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে মরিয়া। যার ফলে দেখা যায়, তারা নিম্নোক্ত টার্গেটগুলোর ওপর তাদের সর্বশক্তি ব্যয় করে থাকে—

১. ইসলামকে বিদ্যমান ইহুদিজম ও খ্রিস্টবাদ থেকে উদ্ভূত ধর্ম অভিহিত করা। অর্থাৎ ইসলাম সর্বশেষ ও সামগ্রিক-বৈশ্বিক ধর্ম নয়; বরং এটি সাবেক ধর্মগুলোর অনুলিপি মাত্র। নাউযুবিল্লাহ।

২. রিসালাত সম্পর্কে জনমনে সংশয় সৃষ্টি করা। ওরিয়েন্টালিস্ট মহল সবসময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াত ও রিসালাত সম্পর্কে জনমনে সংশয়-সন্দেহ সৃষ্টির কাজ চালিয়ে থাকে।

তারা বলে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন সফল চিন্তাবিদ ও জাতীয় নেতা ছিলেন বটে; কিন্তু তাঁর সত্য নবি হওয়াটা সুনিশ্চিত নয়।

৩. কুরআন কারিম সম্পর্কে সন্দেহ সৃষ্টি করা। এর অধীনে তারা সাধারণত এ কথা প্রমাণিত করার ওপর সর্বশক্তি ব্যয় করে থাকে যে, কুরআন কারিম হলো মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রচনা; এটি আসমানি গ্রন্থ নয়।

৪. হাদিসে রাসূল সম্পর্কে সংশয় সৃষ্টি করা। ওরিয়েন্টালিস্ট মহলের সবচেয়ে বড় টার্গেট হলো হাদিসে নববি। এ ব্যাপারে তারা নির্দিষ্ট কিছু আপত্তি তুলে থাকে। যেগুলোর সদুত্তর উলামায়ে ইসলাম দিয়েছেন।

৫. মনগড়া দুর্বল বর্ণনাকে চালিয়ে দেওয়া। ওরিয়েন্টালিস্ট মহল একদিকে হাদিসের নির্ভরযোগ্য উৎসগুলোকে টার্গেট বানিয়ে থাকে, অন্যদিকে তারা নিজেদের গবেষণালব্ধ তত্ত্বগুলোর প্রমাণ হিসেবে ব্যাপক হারে মনগড়া ও দুর্বল বর্ণনা ব্যবহার করে সেগুলো প্রচার করে বেড়ায়।

৬. ইসলামি ফিকাহর ওপর আক্রমণ। তারা এ কথা ছড়ানোর চেষ্টা করে যে, ইসলামি ফিকাহ হলো রোমান ল' থেকে আহরিত।

৭. ত্রিত্ববাদের কনসেপ্ট ছড়িয়ে দেওয়া। ওরিয়েন্টালিস্ট মহলের সিংহভাগ হলো খ্রিস্টান। যার কারণে তাদের সর্বশেষ লক্ষ্য হলো, গোটা পৃথিবীবাসীকে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করা। এজন্যে তারা ছলে-বলে-কৌশলে ত্রিত্ববাদ সত্য প্রমাণিত করার অপচেষ্টা করে থাকে।

রাজনৈতিক ও সাম্রাজ্যবাদী প্রেরণা শক্তি

অধিকাংশ ওরিয়েন্টালিস্টের যাবতীয় চেষ্টা-সাধনার নেপথ্যে রাজনৈতিক ও সাম্রাজ্যবাদী দূরভিসন্ধি প্রাণশক্তি হিসেবে কাজ করে থাকে। সিংহভাগ ওরিয়েন্টালিস্ট সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে। তাদের লক্ষ্য হলো—

১. ইসলামি রীতি-নীতি ও সামাজিকতা অধ্যয়ন করা।

ইসলামি সমাজের সভ্যতা-সংস্কৃতি, ভাষা-সাহিত্য ও মূল্যবোধ সম্পর্কে রীতিমত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা দেওয়া হয়। উদ্দেশ্য হলো, ভূতাত্ত্বিক

বাস্তবতা অনুসারে তারা যেন রাষ্ট্রশক্তিকে যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে পথপ্রদর্শন করতে পারে।

২. ইসলামি রাষ্ট্রগুলোর ভাষা শেখা।

ইসলামি রাষ্ট্রগুলোতে প্রচলিত সবগুলো ভাষার ওপর দক্ষতা অর্জন করে তা রাজনীতি, দূতিয়ালি, বাণিজ্য ও গুপ্তচরবৃত্তির প্রয়োজনে প্রয়োগ করা।

৩. আরবি ভাষার ওপর আক্রমণ করা।

মুসলিমদেরকে নিজ মাযহাবের উৎস থেকে দূরে সরাতে প্রয়োজন আরবি ভাষার সঙ্গে তাদের বিদ্যমান সম্পর্ক কেটে দেওয়া। এ প্রেক্ষাপটে তারা আরবি ভাষার সাহিত্যমাণের ওপর প্রশ্ন তুলে এবং আরবি ভাষার ভেতরে ইউরোপিয়ান শব্দ ঢুকিয়ে মূল আদি রূপ বিকৃত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে।

৪. আরব রাষ্ট্রগুলোতে আরবি ভাষার স্থলে সেখানকার স্থানীয় আদি পরিত্যক্ত ভাষাগুলো ছড়িয়ে দেওয়া।

আরববিশ্বের নিজস্ব পরিচয় ধ্বংস করার জন্যে সেখানকার আদিম যুগের পরিত্যক্ত ভাষাগুলো নতুন করে পুনরুজ্জীবিত করা হচ্ছে।

৫. অমুসলিমদের ভাষা ও বাজারি ভাষা প্রতিষ্ঠায় উৎসাহ দেওয়া।

ভারত ও বাংলাদেশে মুসলিমদের ভাষা উরদূ ও বাংলার মুকাবিলায় হিন্দি ভাষা ছড়িয়ে দেওয়ার অপচেষ্টায় তারা যথেষ্ট সফলতা অর্জন করেছে। পাকিস্তানে ভারতীয় মিডিয়ার মাধ্যমে বাজারি ভাষা ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে।

৬. মুসলিম জাহানে ইউরোপিয়ান ভাষা ছড়িয়ে দেওয়া।

মরক্কোয় স্পেনিশ, আলজেরিয়ায় ফরাসি, লিবিয়ায় ইটালিয়ান, পাকিস্তান-ভারতসহ অধিকাংশ মুসলিম রাষ্ট্রে ইংরেজি ভাষা ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। যার ফলে মুসলিম জাহানের স্থানীয় ভাষাগুলোর অস্তিত্ব এখন হুমকির মুখে।

৭. মুসলিমদের বিভিন্ন গোত্র, রাষ্ট্র ও শ্রেণির মাঝে ঘৃণার আগুন উস্কে দেওয়া। মুসলিম জাহানের একটি শ্রেণিকে অন্য শ্রেণির বিরুদ্ধে, একটি

সম্প্রদায়কে অন্য সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে এবং একটি রাষ্ট্রকে অন্য রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে রীতিমত ক্ষুব্ধ-বিক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত করার জন্যে গবেষণামূলক গ্রন্থ লেখা হচ্ছে। উদ্দেশ্য হলো, এর মাধ্যমে মুসলিমদেরকে পারস্পরিক মতানৈক্যে লিপ্ত রাখা এবং রাজনৈতিকভাবে কখনো এক ও সম্মিলিত শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হতে না দেওয়া।

৮. পশ্চিমা বিশ্বকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে-সাজিয়ে-গুছিয়ে উপস্থাপন করা এবং অবশিষ্ট বিশ্বের ওপর এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত করা।

ওরিয়েন্টালিস্টদের বই পড়ে একজন সাধারণ মুসলমানের মনেও এ অনুভূতি জাগবে যে, সে এখন মানবসমাজে নয়; জন্তু-জানোয়ারদের মাঝে বসবাস করছে। মানুষ থাকলে কেবল ইউরোপেই আছে। মুসলিমদেরকে এ ব্যাপারে উৎসাহ জোগানো হচ্ছে যে, তারা যেন দ্বীনদার ও দ্বীনদারি— উভয়টি থেকে নিরাপদ দূরত্বে থেকে পশ্চিমাদের অন্ধ অনুকরণ করাকে নিজের জন্যে সম্মানজনক মনে করে।

৯. মুসলিমদেরকে দুর্বল ও অজ্ঞ অভিহিত করা।

অধিকাংশ ওরিয়েন্টালিস্ট মুসলিমদের প্রতি সহমর্মিতার ভাব দেখিয়ে জেনে-বুঝে ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের মাঝে হতাশা ছড়িয়ে দেয়। তাদের লেখা সাহিত্য পড়ে একজন সাধারণ মুসলমান এ কথা ভাবতে শুরু করে যে, পৃথিবীর বুকে মুসলিম জাহানের এক পয়সা মূল্যও নেই। জাতি হিসেবে মুসলিমরা কখনই সংশোধনযোগ্য নয়।

১০. জিহাদের অপব্যাখ্যা করা।

পশ্চিমাবিশ্ব সবসময় মুসলিমদের জিহাদি স্পৃহা সম্পর্কে আতঙ্কে থাকে। এজন্যে ওরিয়েন্টালিস্টরা মুসলিমদেরকে জিহাদ থেকে দূরে সরিয়ে রাখার অপচেষ্টা হিসেবে বিভিন্ন ধরনের অপব্যাখ্যা শিখিয়ে দেয়।

আত্মরক্ষার প্রেরণা শক্তি

ওরিয়েন্টালিস্ট মহল ইসলাম সম্পর্কে ঘৃণাব্যঞ্জক বই-পত্র ছড়িয়ে দিয়ে ইসলামের দাওয়াতের পথ বন্ধ করার চেষ্টা করে থাকে। উদ্দেশ্য হলো, মানুষ খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করুক, বা না করুক, নিদেনপক্ষে যেন ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় না নেয়।

বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক প্রেরণা শক্তি

পশ্চিমা প্রকাশকরা বাণিজ্যিক মুনাফার স্বার্থে প্রাচ্য বিষয়ক রচিত বই-পুস্তক ও গবেষণাপত্রের পৃষ্ঠপোষকতা করে এবং তা মুদ্রণ করে গোটা পৃথিবীতে বিক্রি করে। এ পথ ধরে তারা প্রচুর অর্থ হাতিয়ে নেয়।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা কেন্দ্রিক প্রেরণা শক্তি

কিছু ওরিয়েন্টালিস্ট নিরেট জ্ঞানচর্চার উদ্দেশ্যে প্রাচ্য সম্পর্কে গবেষণায় আত্মনিয়োগ করে থাকে। তাদের গবেষণার মানদণ্ড তুলনামূলকভাবে অন্য ওরিয়েন্টালিস্টের তুলনায় ভালো। তাদের রচনাবলির উপকারিতা আপন স্থানে অনস্বীকার্য; কিন্তু সমস্যা হলো, এগুলোর মাধ্যমে মুসলিম সমাজে অন্য ওরিয়েন্টালিস্টদের এমন বইপত্র ছড়িয়ে পড়ার পথ সুগম হয়ে যায়, যেগুলো বিষাক্ত।

প্রাচ্যবিদদের দুটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য

১. ইসলামের আকিদা ও শরিয়ত ধ্বংস করা।

ওদের প্রধান বুনিয়াদি লক্ষ্য হলো, ইসলামি আকিদা ও ইসলামি শরিয়াহর নাম-নিশানা মুছে ফেলা।

২. পশ্চিমাবিশ্বকে ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে রাখা।

প্রাচ্যতত্ত্বের মাধ্যমে পশ্চিমাবিশ্বকে ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে রাখার অপচেষ্টা পুরোদমে চলছে।

প্রাচ্যতত্ত্বের পুঁজি ও উপকরণ

وسائل الاستشراق

(Resources of Orientalism)

ওরিয়েন্টালিস্টদের মাধ্যম ও উপকরণকে আমরা দুটি ভাগে ভাগ করতে পারি–

১. সরাসরি মাধ্যম (Direct resources)।
২. ভায়া মাধ্যম (Indirect resources)।

প্রাচ্যতত্ত্বের সরাসরি মাধ্যম

যে মাধ্যমগুলো প্রাচ্যবিদদের প্রকাশ্য উপকরণ হয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে, সেগুলোর মধ্য হতে উল্লেখযোগ্য হলো,

১. বই-পত্র
২. অনুবাদ সাহিত্য
৩. দৈনিক ও মাসিক ম্যাগাজিন, সাহিত্যপত্র ও সংবাদপত্র
৪. কনফারেন্স, সেমিনার ও কনভেনশন
৫. বিভিন্ন ইনসাইক্লোপিডিয়া
৫. ইলেক্ট্রনিক্স মিডিয়া (রেডিও, সিনেমা, টিভি ও ইন্টারনেট)।

প্রাচ্যতত্ত্বের ভায়া মাধ্যম

ভায়া মাধ্যমগুলোর তালিকায় রয়েছে,

১. ওরিয়েন্টালিস্টদের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়
২. পশ্চিমাবিশ্বের বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির ইসলামি ও প্রাচ্য বিষয়ক অনুষদ
৩. ওরিয়েন্টালিস্টদের শিষ্য।

প্রাচ্যবিদদের আক্রমণের পদ্ধতি ও গবেষণার মাণদণ্ড

- ওরিয়েন্টালিস্টরা সবার আগে গবেষণার একটি লক্ষ্য স্থির করে নেয়।
- এরপর সেই লক্ষ্য পূরণের জন্যে কোনো সঙ্গত বিষয়বস্তু নির্বাচন করে।
- কুরআন, হাদিস ও ফিকাহ থেকে শুরু করে ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলি এমনকি সাহিত্য, কাব্যজগত ও ভ্রমণকহিনী থেকেও তত্ত্ব কুড়াতে শুরু করে। এগুলোর সাহায্যে সে তার কাঙ্ক্ষিত দৃষ্টিভঙ্গির কাঠামো নির্মাণ করে।
- একটি ভিত্তিহীন বক্তব্যকেও সে জালিয়াতি ও প্রতারণার মাধ্যমে এমনভাবে সাজিয়ে-গুছিয়ে পেশ করে যে, পাঠক প্রভাবিত না হয়ে পারে না।

প্রাচ্যবিদদের সফলতার নেপথ্য কারণ

প্রাচ্যবিদদের সফলতার পেছনে যে কারণগুলো ভূমিকা রাখে,

- মুসলিমদের অজ্ঞতা।
- ইংরেজি ভাষার প্রভাব।
- মুসলিমদের জ্ঞানীমহলের নীরবতা, পৃষ্ঠপোষকতার অভাব ও মনোবল ভেঙে পড়া।
- এর বিপরীতে ওরিয়েন্টালিস্টদের জন্যে থাকে রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে প্রচুর সুযোগ-সুবিধা ও পৃষ্ঠপোষকতা।

প্রাচ্যতত্ত্বের প্রতিপাদ্য

ওরিয়েন্টালিস্টরা তাদের রচনাবলি, বক্তৃতা ও প্রবন্ধ-নিবন্ধে সাধারণত এ বিষয়গুলোকে প্রতিপাদ্য বানিয়ে থাকে–

১. মহান আল্লাহর সত্তা
২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াত ও রিসালত
৩. কুরআন কারিম
৪. হাদিস সমগ্র

৫. ইসলামি ফিকাহ
৬. কুরআনের ভাষা, আরবি
৭. সিরাতুন নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
৮. ইসলামের ইতিহাস
৯. বিভিন্ন ইসলামি ফিরকাহ
১০. বিভিন্ন ইসলামি রাষ্ট্র
১১. বিভিন্ন ইসলামি আন্দোলন।

প্রাচ্যতত্ত্বের মুকাবিলা কীভাবে করতে হবে?

প্রাচ্যতত্ত্বকে প্রতিহত করার জন্যে বর্তমান সময়ের মুসলিম বুদ্ধিজীবি ও জ্ঞানীগণ যেই সুপারিশমালা প্রণয়ন করেছেন, তা নিম্নরূপ-

১. 'চিন্তাযুদ্ধ'-কে মুসলিম বিশ্বের পাঠ্য কারিকুলামে অন্তর্ভুক্ত করা
২. প্রাচ্যতত্ত্বকে প্রতিহত করার জন্যে স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান কায়েম করা। অথবা নিদেনপক্ষে ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে এ বিষয়ের ওপর বিশেষ অনুষদ প্রতিষ্ঠা করা।
৩. আলোচিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর ওপর মানসম্পন্ন গবেষণামূলক কাজ করা যে, যেন ওরিয়েন্টালিস্টদের কাজগুলো এগুলোর সামনে ম্লান হয়ে যায়।
৪. গবেষণামূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে প্রাচ্যবিদদের সূক্ষ্ম প্রতারণা, ভুল শিক্ষা ও অজ্ঞতা সবার সামনে অকাট্য প্রমাণাদি সহকারে স্পষ্ট করে তোলা।

কয়েকজনে প্রসিদ্ধ প্রাচ্যবিদ

উইলিয়াম ম্যুর (William Muir)
(১৮১৯-১৯০৫ ঈ.)

লোকটি ছিল মিশনারি পাদরি। তার লেখা The Life of Muhammad ও The Koran: its Composition and Teaching খুবই সমাদৃত। The Life of Muhammad গ্রন্থে সে নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর বিভিন্ন স্থানে আপত্তি তুলে তাঁর নবুওয়াত ও রিসালাতকে প্রশ্নবিদ্ধ ও সন্দেহযুক্ত করার অপচেষ্টা করেছে।

গোল্ড যিহার (Ignác Goldziher)
(১৮৫০-১৯২১ ঈ.)

উগ্র ইহুদি ওরিয়েন্টালিস্ট। তাকে প্রাচ্যবিদদের শীর্ষস্থানীয় সংস্কারক ও উদ্ভাবক মনে করা হয়। ইসলামের বিশ্বাস, শরিয়ত, কুরআন কারিম ও হাদিস সম্পর্কে সে অনেকগুলো উগ্রতাদুষ্ট গ্রন্থ রচনা করেছে। এর মধ্য হতে Introduction to Islamic Theology and Law এবং Muslim Studies খুবই প্রসিদ্ধ।

টমাস আর্নল্ড (Thomas Walker Arnold)
(১৮৬৪-১৯৩০ ঈ.)

তাকে মধ্যপন্থী প্রাচ্যবিদ মনে করা হয়। তার লেখা The preaching of Islam বেশ প্রশিদ্ধ।

স্ট্যানলি লেনপুল (Stanley Lane-Poole)
(১৮৫৪-১৯৩১ ঈ.)

সালাহ উদ্দীন আইয়ূবি রহ.-এর ওপর ভারসাম্যপূর্ণ ঐতিহাসিক (Saladin and the Fall of the Kingdom of Jerusalem) গ্রন্থ লেখার কারণে লোকটি মুসলিম জাহানে বিখ্যাত।

প্রিন্স লিওন (Leone Caetani)
(১৮৬৯-১৯৩৫ ঈ.)

আরবি ও ফারসি ভাষায় অসামান্য দক্ষতার অধিকারী ইটালিয়ান প্রাচ্যবিদ। তার বিখ্যাত রচনা Annali dell'Islam দশ খণ্ডে সমাপ্ত। ওরিয়েন্টালিস্ট মহল ইসলামের ইতিহাস প্রসঙ্গে এটিকে উৎসগ্রন্থ মনে করে।

হেনরি ল্যামেন্স (Henri Lammens)
(১৮৬২-১৯৩৭ ঈ.)

বৈরুতের ক্রিশ্চিয়ান কলেজের এই নেপথ্য প্রাচ্যবিদ মিশনারি সমাজের শীর্ষস্থানীয় সদস্য। ইসলামের বিরুদ্ধে সে সবসময় উগ্র অবস্থান গ্রহণ করত। মহান খলিফায়ে রাশেদিনের জীবন ও বনু উমাইয়া শাসকদের ব্যক্তিজীবন কলুষিত করার কোনো অপচেষ্টাই এ লোক বাকি রাখেনি।

এ. জে. ওয়েনসিংক (A. J. Wensinck)
(১৮৮২-১৯৩৯)

مفتاح كنوز السنة এবং المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي সংকলনের মাধ্যমে মুসলিমবিশ্বের জ্ঞানী-গুণীদের প্রশংসা ও অভিনন্দন কুড়িয়েছিল। কিন্তু তার অন্যান্য গ্রন্থে ইসলাম সম্পর্কে তার বিদ্বেষ ও হিংসাত্মক মনোভাবের প্রকাশ ঘটেছে।

স্যামুয়েল জুয়েমার (S M Zweimer)
(১৮৬৭-১৯৫২ ঈ.)

এই মার্কিন পাদরির ইসলামবৈরীতা প্রসিদ্ধ। মিশনারীদেরকে ইসলামের বিরুদ্ধে প্রমাণাদি সরবরাহ করার উদ্দেশ্যে তিনি ডজনখানেক বই লিখেছেন।

আনামেরি শিমেল (Annemarie Schimmel)
(১৯২২-২০০৩ ঈ.)

জার্মানির এই বিশ্বখ্যাত মহিলা প্রাচ্যবিদ সামাজিক বিজ্ঞান, ভাষাতত্ত্ব ও ধর্মের ইতিহাস সম্পর্কে পণ্ডিত ছিলেন। মরহুম ইকবাল ও মাওলানা রুমি

রহ.-এর প্রতি তার বিশেষ আগ্রহ ছিল। ফারসি, সিন্ধি, উরদূ ও তুর্কি ভাষার নির্বাচিত কবিতাগুলো ইংরেজি ও জার্মান ভাষায় অনুবাদ করেছেন।

বার্নার্ড লুইস (Bernard Lewis)
(১৯১৬ ঈ.)

বর্তমান যুগের সবচেয়ে বড় ইহুদি প্রাচ্যবিদ। ইসলামের ইতিহাস, ইসমাইলি, হাশ্যাশিন সম্প্রদায়সহ আরববিশ্বের বিভিন্ন প্রসঙ্গ ও ইসলামি আন্দোলনসমূহের ওপর তিনি অনেকগুলো বই লিখেছেন।

বুদ্ধিবৃত্তিক ক্রুসেডের দ্বিতীয় ক্ষেত্র

الاستعمار [আল-ইসতি'মার] বা সাম্রাজ্যবাদ
(Colonialism, Colonizing, Imperialism)

الإستعمار বা সাম্রাজ্যবাদের ব্যাখ্যা হলো—

> 'কোনো অঞ্চলের ওপর নিজের এজেন্ট প্রতিষ্ঠিত করে এমনভাবে দখলদারিত্ব অর্জন করা যে, স্থানীয় পুঁজিগুলো অনায়াসে লুট করে নিতে পারবে।'

ক্যামব্রিজ অভিধানে "Colonialism" এর সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে—

> 'প্রশাসনকে এমনভাবে ছড়িয়ে দেওয়া যে, এর মাধ্যমে একটি রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের যাবতীয় বিষয়-আশয় নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে।'

সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবের বুনিয়াদ

সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবের সবচেয়ে পুরনো দৃষ্টান্ত গ্রিকবীর মহান আলেকজান্ডারের বিজয়প্রবাহ ও তার সমকালীন দার্শনিক এরিস্টেটলের শিক্ষার মাঝে পাওয়া যায়। এই পলিসি বাস্তবায়ন করেই গ্রিকরা চারশ বছর দোর্দণ্ড প্রতাপে এশিয়া করতলগত করে রেখেছিল।

মুসলিমবিশ্বের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী অপচেষ্টার প্রথম যুগ

পৃথিবীর বুকে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ইউরোপিয়ান সাম্রাজ্যবাদের সূচনাকাল হচ্ছে খলিফায়ে রাশেদিনের আমল। তখন থেকেই ইউরোপিয়ানদের সাম্রাজ্যবাদী অপচেষ্টা শুরু হয়। যা সমাপ্ত হয়েছে ক্রুসেডীয় যুদ্ধগুলোর পরিসমাপ্তির মাধ্যমে। সাম্রাজ্যবাদের অপচেষ্টার

অংশ হিসেবে ইসলামবৈরী শক্তিগুলো সবসময় নিম্নোক্ত চারটি লক্ষ্য পূরণ করতে মরিয়া হয়ে কসরত করতো—

১. ইসলামি খিলাফত ধ্বংস করা।
২. পুণ্যভূমিগুলো দখল করা।
৩. মুসলিমজাহান করতলগত করা।
৪. মুসলিমবিশ্বকে নিশ্চিহ্ন করা।

১. ইসলামি খেলাফাত ধ্বংস করা

খুলাফায়ে রাশেদিনের আমল থেকে শুরু করে আব্বাসিয়া খিলাফত পর্যন্ত ইতিহাসের এই বিস্তীর্ণ সময়ে কুফরি শক্তিগুলো ইসলামি খিলাফত ধ্বংস করার একের পর এক অপচেষ্টা চালিয়েছে। ৬১৬ হিজরিতে চেঙ্গিস খান মুসলিমজাহানের ওপর আক্রমণ করে। তার উত্তরসূরি হালাকু খান মুহাররম ৬৫৬ হিজরিতে বাগদাদ তছনছ করে আব্বাসি খিলাফতকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেয়। ওই সময় খ্রিস্টানরা তাদের পূর্ণ সমর্থন দিয়েছিল।

২. পুণ্যভূমিগুলো দখল করা

পুণ্যভূমিগুলো ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে তারা মুসলিমজাহানের ওপর ক্রুসেড যুদ্ধের নারকীয় তাণ্ডব উগড়ে দেয়। এ উদ্দেশ্যে তারা অগণিত মুসলিমকে হত্যা করেছে।

৩. মুসলিম জাহান করতলগত করা

ইউরোপের একমাত্র লক্ষ্য বাইতুল মাকদিস দখল করা নয়; বরং তারা মুসলিম জাহানের পুরো ভূখণ্ড ও যাবতীয় সম্পদ হাতিয়ে নিতে মরিয়া।

৪. মুসলিমবিশ্বকে নিশ্চিহ্ন করা

তারা ক্রুসেড যুদ্ধের মাধ্যমে এবং তাতারিদের এই বর্বরোচিত আক্রমণের পক্ষে সহায়তা ও সমর্থন দানের মাধ্যমে মূলত পৃথিবীর বুক থেকে ইসলামের নাম-নিশানা মুছে দিতে চেয়েছিল। তাদের বাসনা ছিল, এর মাধ্যমে গোটা পৃথিবীতে খ্রিস্টধর্মের বিজয় নিশান উড়বে। এই উদগ্র বাসনাই তাদের যাবতীয় কীর্তিকলাপের নেপথ্য প্রেরণা।

প্রতিপক্ষের ব্যর্থতার কারণ

মুসলিমদের তিনটি বৃহৎ ও গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপের কারণে খ্রিস্টান ও তাতারিদের সকল অপচেষ্টা শেষ পর্যন্ত নস্যাৎ হয়েছে-

১. ইসলামের দিকে আহ্বানের মহান মেহনত। যার বদৌলতে আক্রমণকারী তাতারিরা নিজেরাই ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নেয়।

২. মিসরে বনু আব্বাসি খিলাফত পুনর্বহাল করা।

৩. সর্বাবস্থায় জিহাদের পতাকা উড়ন্ত রাখা। যার ফলে তাতারি ও ক্রুসেডার— উভয় পক্ষকেই শোচনীয় পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছিল।

চিন্তাধারা, মূল্যবোধ ও মানসিকতা পরিবর্তনের যুগ

এভাবে তিক্ত অভিজ্ঞতার স্বাদ আস্বাদন করার পর ইসলামবৈরী শক্তিগুলো বুঝতে পারে— এতো সহজে ইসলামি খিলাফত ধ্বংস, পুণ্যভূমিগুলো দখল ও মুসলিমদের নিশ্চিহ্ন করা যাবে না। এর আগে কৌশলে রাস্তা মসৃণ করতে হবে। সেই ভাবনা থেকেই তারা চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত নিজেদেরকে সার্বিকভাবে শক্তিশালী করার কার্যক্রম পুরোদমে চালিয়ে যায়। এ কাজ সফলতার সঙ্গে সম্পন্ন করার পর তারা গোটা দুনিয়া দখল করার নতুন চেষ্টা শুরু করে।

যে চারটি ঘটনার ফলে সাম্রাজ্যবাদী চিন্তা প্রসারিত হয়

ইতিহাসের চারটি ঘটনা এতোটাই গুরুত্বপূর্ণ যে, সেগুলো থেকেই ইউরোপ নতুন পথে সাম্রাজ্যবাদ বিস্তারের প্রেরণা লাভ করে—

১. ১৪৫৩ ঈসাব্দে উসমানি শাসক সুলতান মুহাম্মদ ফাতিহ কর্তৃক কনস্টেন্টিনোপল জয়।

২. তখন কনস্টেন্টিনোপলের গ্রিক দার্শনিক ও শাসকগণ ইউরোপে চলে যায়। মূলত এদের হাত ধরেই ইউরোপের মাটিতে সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবের বিকাশ ঘটে।

৩. ১৪৯২ সালের জানুয়ারি মাসে স্পেনের ওপর খ্রিস্টানদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ও অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

৪. তুর্কিরা ইউরোপিয়ান বণিকদের জন্যে বাণিজ্যের সবগুলো পথ বন্ধ করে দিয়েছিল। যার কারণে ইউরোপিয়ান বণিকরা ব্যবসা-বাণিজ্যের নতুন পথের সন্ধানে নেমে পড়ে।

সাম্রাজ্যবাদের আসল যুগ

ঈসায়ি ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিকে আসল সাম্রাজ্যবাদ শুরু হয়। ইউরোপিয়ান গোষ্ঠীগুলো সাম্রাজ্যবাদের দিকে কীভাবে অগ্রসর হয়েছে, সেই পথচিহ্ন খতিয়ে দেখলে দেখা যায়—

১. অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক স্বনির্ভরতা অর্জন,
২. মুসলিম জাহানের ওপর অর্থনৈতিক ও সামরিক অবরোধ আরোপ,
৩. ব্যবসা ও অর্থনীতির ময়দানে প্রধান্য বিস্তার করা,
৪. ইসলামিবিশ্বের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা,
৫. ইসলামি খিলাফত ধ্বংস করা,
৬. মুসলিম জাহানকে টুকরো টুকরো করা,
৭. মুসলিম জাহানের স্বাতন্ত্র্য ধ্বংস করা।

প্রথম স্তর

স্বনির্ভর অর্থব্যবস্থা ও সুদৃঢ় বাণিজ্য

যখন তুর্কিরা নিজেদের নিরাপত্তার স্বার্থে ইউরোপের জন্যে জল ও স্থলভাগের ওপর দিয়ে বাণিজ্যিক করিডোর বন্ধ করে দেয় তখন ইউরোপিয়ান বণিকদের অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়ে। যার ফলে তারা সর্বপ্রথম এ পদক্ষেপ গ্রহণ করে যে, বাণিজ্যিক পথ অনুসন্ধান করে তুর্কিদের পক্ষ থেকে আরোপিত অর্থনৈতিক অবরোধ অকার্যকর প্রমাণিত করতে হবে। ওই সময় স্পেনের রাজা ছিল ফার্ডিন্যান্ড আর পর্তুগালের রাজা ছিল ম্যানুয়েল। ফার্ডিন্যান্ড ও তার রানী ঈসাবেলা নৌপথ আবিস্কার করার জন্যে ১৪৯২ সালের আগস্ট মাসে কলম্বোসকে পৃথিবীর পূর্বাঞ্চলীয় দেশগুলোতে যাওয়ার পথ খুঁজে বের করার মিশনে প্রেরণ করে; কিন্তু কলম্বাস রাস্তা হারিয়ে পৌঁছে যায় নতুন পৃথিবী দক্ষিণ আমেরিকায়। ওদিকে পর্তুগালের রাজা ম্যানুয়েল

১৪৯৭ সালের জুলাই মাসে একই উদ্দেশ্যে ভাস্কো দা গামাকে প্রেরণ করে। ১৪৯৮ সালের ১৮ মে সে ভারতবর্ষের মাটিতে পা রাখে। ওই সময় তারা শুধু বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে এসেছিল বললে ভুল হবে; বরং তাদের উদ্দেশ্য ছিল, দুর্বল রাজ্যগুলোর ওপর গায়ের জোরে কর্তৃত্ব স্থাপন করা। ভাস্কো দা গামার অভিযানের মাধ্যমে ইউরোপের সামনে বাণিজ্যের নতুন পথ ও লুটতরাজের নতুন ক্ষেত্র আবিস্কৃত হয়। তখন থেকেই শুরু হয় ইউরোপের আর্থিক স্বচ্ছলতার নতুন যুগ।

দ্বিতীয় স্তর
মুসলিম বিশ্বের ওপর অর্থনৈতিক ও সামরিক অবরোধ আরোপ

এ ঘটনার মাত্র কয়েক বছরের ভেতর ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রের সুসজ্জিত নৌবাহিনী মুসলিম জাহানের অনেকগুলো সমুদ্রোপকূলীয় এলাকা দখল করে নেয়। ধীরে ধীরে তাদের সাড়াশি অভিযান এতোটাই শক্তিশালী হয়ে ওঠে যে, মুসলিম জাহান নিজেই অর্থনৈতিক ও সামরিক অবরোধের চতুর্বেষ্টনীর ভেতর আবদ্ধ হয়ে পড়ে।

পর্তুগাল ১৫১৫ ঈসাব্দে মাস্কাট, হুরমুজ প্রণালী ও বাহরাইনের মতো ভৌগলিক গুরুত্বপূর্ণ বন্দরগুলো দখল করে নেয়। যার ফলে অনারব দেশগুলোর সঙ্গে আরববিশ্বের বাণিজ্যিক পথগুলোর ওপর ইউরোপের শতভাগ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়।

অন্যদিকে স্পেন একের পর এক অভিযান চালিয়ে ১৫২১ ঈসাব্দে প্রশান্ত মহাসাগর পেরিয়ে ফিলিপাইন পৌঁছে যায়। ১৫৬৫ ঈসাব্দে তারা ফিলিপাইনের সমুদ্রোপকূলীয় অঞ্চলগুলো দখল করে।

ওদিকে পুরো এক শতাব্দী ভারতীয় উপমহাদেশের উপকূলগুলোর ওপর পর্তুগিজদের ইজারাদারি কায়েম থাকে। ঈসায়ি ষোড়শ শতাব্দীর শেষদিকে ওলান্দাজ (ডাচ)-রা আগমন করে। ১৬০০ ঈসাব্দে ইংরেজরাও 'ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি' গড়ে তোলে। উপর্যুপরি কয়েক বছরের চেষ্টায় তারা মোঘলসম্রাট জাহাঙ্গিরের কাছ থেকে 'ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি'র নামে বাণিজ্যিক পরোয়ানা হাসিল করতে সমর্থ হয়। ১৬৬৪

ঈসাব্দে ফরাসি বণিকরাও 'ফ্রেঞ্চ-ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি' নামে একটি বাণিজ্যিক ফার্ম বানিয়ে ভারতীয় উপমহাদেশের উপকূলগুলোর ওপর নিজেদের দৌড়ঝাঁপ শুরু করে দেয়।

আওরঙ্গজেব আলমগির যখন অনুভব করেন, ইংরেজরা বাণিজ্যের ছদ্মবেশে রাজনৈতিক শক্তিশালী হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার চেষ্টা করছে, তখন তিনি তাদের ওপর পুনরায় বিধি-নিষেধ আরোপ করেন। কিন্তু বরাবরের মতো এবারও তারা কৌশলে ক্ষমা বাগিয়ে নেয়। মোঘলসম্রাটগণ মনে করতেন, তাদের প্রকাণ্ড শক্তিমত্তা ও রাজকীয় জৌলুসের সামনে বিদেশি বণিকরা কোনো ধরনের আতঙ্ক সৃষ্টি করতে পারবে না। এজন্যে তারা তাদের অপরাধ ক্ষমা করে দেন। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর বিদেশি কোম্পানিগুলো লাগামহীন স্বাধীনতা পেয়ে যায়। ঈসায়ি অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তারা মুসলিমবিশ্বের ওপর অর্থনৈতিক ও সামরিক কর্তৃত্ব স্থাপন করতে সক্ষম হয়।

তৃতীয় স্তর
বাণিজ্য ও অর্থব্যবস্থায় ক্রমবর্ধবান উন্নতি

মুসলিমবিশ্বের ওপর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কর্তৃত্ব পুরোপুরিভাবে স্থাপন করার পর বিশ্ববাণিজ্যও ইউরোপিয়ান শক্তিগুলোর হাতে চলে যায়। ইউরোপিয়ান শক্তিগুলো কয়েক দশকের মধ্যে নিজেদের ভাণ্ডার ধন-সম্পদে টইটুম্বর করে ফেলে। ঈসায়ি অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে এসে ইউরোপ কল-কারখানা, ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক শক্তিমত্তার বিচারে অধিকাংশ ইসলামি রাষ্ট্র থেকে অনেক দূর এগিয়ে যায়।

চতুর্থ স্তর
মুসলিম জাহানের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা

ইংরেজরা ১৭৫৭ ঈসাব্দে নবাব সিরাজ উদ দৌলাকে পলাশির মাঠে পরাজিত করে বঙ্গদেশের ওপর অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। ৪ মে ১৭৯৯ সালে তারা গাদ্দারদের সহযোগিতায় মহিশূর দখল করে। মহিশূরের

শাসক মুজাহিদ টিপু সুলতান রহ. রক্তাক্ত রণাঙ্গনে লড়াই করে শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করেন। ১৮৪৩ সালে তারা সিন্ধ, ১৮৪৯ সালে পাঞ্জাব ও ১৮৫৭ সালে দিল্লি নগরীও দখল করে। সর্বশেষ মোঘল সম্রাট বাহাদুর শাহ যাফরকে গ্রেফতার করার মাধ্যমে মোঘল সাম্রাজ্যের পতন ঘটে।

অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রের ওপরও বৃটিশদের আক্রমণ অব্যাহত থাকে। ইংরেজরা ১৮৫১ সালে নাইজেরিয়া, ১৮৮৮ সালে মিসর, ১৮৯৮ সালে সুদান, ১৯১৪ সালে ইরাক ও ১৯১৮ সালে জর্ডান ও ফিলিস্তিনের ওপর ইংরেজদের দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সময় তারা ১৮৪০, ১৮৮০ ও ১৯১৮ সালে উপর্যুপরি তিনবার আফগানদের সঙ্গে শক্তিপরীক্ষায় আবির্ভূত হয়; কিন্তু একবারের জন্যেও তারা আফগানিস্তান দখল করতে পারেনি।

রাশিয়া

রাশিয়া ১৫৫৬ ঈসাব্দে নওমুসলিম তাতারিদের রাজধানী 'ইসতিরাখান' দখল করে মধ্যএশিয়ার মুসলিম রাষ্ট্রগুলো ও ইরান অভিমুখে অভিযান পরিচালনার পথ পেয়ে যায়। ১৬৭০ ঈসাব্দে ঝিলআওরাল দখল করে। ১৬৯৬ ঈসাব্দে তুরস্কের প্রশিদ্ধ শহর 'আযুফ' ও ১৭৭৮ সালে তুরস্কের প্রতিরক্ষা নগরী 'ক্রিমিয়া' দখল করে। ১৮২৪ ঈসাব্দে কালো সাগরের সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দ্বীপ ক্রেম দখল করে। ঊনবিংশ শতকে তারা মধ্যএশিয়ার দিকে অগ্রসর হতে থাকে। ১৮৬৪ সালে কাফকায, ১৮৬৭ সালে তাশকন্দ, ১৮৬৮ সালে বুখারা, ১৮৭৩ সালে খিওয়াহ ও ১৮৮৪ সালে মার্ভ নগরীর ওপর রাশানদের একচ্ছত্র কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় সমাজতন্ত্রের বিপ্লব ঘটে। যার ফলে মধ্যএশিয়ার মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর সর্বশেষ স্বাধীনতাটুকুও কেড়ে নেওয়া হয়। মসজিদ-মাদরাসা বন্ধ করে দেওয়া হয়। লক্ষ লক্ষ মুসলিমকে হত্যা করা হয়। এরচেয়েও অধিক মুসলিমকে দেশ থেকে বিতাড়িত করা হয়।

ফ্রান্স

ফ্রান্স ১৮৩০ সালে আলজেরিয়া, ১৮৮১ সালে তিউনিসিয়া, ১৮৮২ সালে সেনেগাল ও মাদাগাস্কার, ১৯১২ সালে মরক্কো ও ১৯২১ সালে শামদেশ দখল করে।

ইটালি

ইটালি ১৮৮৭ সালে সোমালিয়া ও ইরিত্রিয়ার ওপর এবং ১৯১১ সাল লিবিয়ার ওপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে।

মোটকথা, বিংশ শতাব্দীর শুরুতে প্রায় পুরো মুসলিম জাহান সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর কাছে স্বাধীনতা খুইয়ে বসে।

পঞ্চম স্তর

উসমানি খেলাফতের পতন

এভাবে দিনে দিনে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো ইসলামি খিলাফত ধ্বংস করার যোগ্য হয়ে উঠে। ইউরোপিয়ান রাষ্ট্রগুলোর পৃষ্ঠপোষকতায় 'জাতীয় ঐক্য ও অগ্রগতি দল' এর মত সংগঠনগুলো খিলাফাত ও ইসলামের বিভিন্ন প্রতীকের ক্রমাগত অবমাননা শুরু করে দেয়। তারা মুসতফা কামাল পাশার মতো কিছু এজেন্ট তৈরি করে ছেড়ে দেয়। ১৯০৯ সালে এই এজেন্টরাই খলিফার সকল ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে সেখানে পশ্চিমা ধাঁচের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তির পর বিজয়ী সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলো পেশী শক্তি প্রয়োগ করে তুরস্কের হাত থেকে শামদেশ, ফিলিস্তিন ও ইরাক কেড়ে নেয়। ১৯২৪ সালে মুসতফা কামাল ইসলামবিদ্বেষী শক্তিগুলোর পরোক্ষ প্ররোচনায় খিলাফতের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করে।

খিলাফত পুনপ্রবর্তনের স্বপ্নের মৃত্যু

পৃথিবীর বুকে পুনরায় যেন খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হতে না পারে, এজন্যে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো নিম্নের পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করে—

১. আধুনিকতাবাদের সয়লাব ছড়িয়ে দিয়ে ইসলামের সঙ্গে জনতার বন্ধন দুর্বল করে ফেলতে হবে।

২. মুসলিমদের মাঝে জাতীয়তা ও দেশপ্রেমের আবেগ উস্কে দিতে হবে, যেন এক খলিফার ওপর তাদের ঐকমত্য অসম্ভব হয়ে পড়ে।

৩. তারা বেশ জোরে-শোরে এ প্রোপাগান্ডা ছড়াতে থাকে যে, খিলাফত হলো একটি বিকলাঙ্গ ও অপ্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান।

৪. গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে তারা তুরস্কের উন্নতির গ্যারান্টি প্রচার করতে থাকে।

৫. আন্তর্জাতিক কলহ-বিবাদ সমাধান করার জন্যে খিলাফতের স্থলে ১৯১৭ সালে একটি বিকল্প আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান 'লিগ অফ নেশন্স' এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে।

৬. তারা খিলাফতের পতন ঘটিয়েছিল খোদ মুসলিমদের হাতে। উদ্দেশ্য ছিল, মুসলিমজাহানে যেন এর কারণে কোনো অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া ও উত্তেজনা দেখা না দেয়।

ষষ্ঠ স্তর

মুসলিম জাহানকে শতধা বিভক্ত করা

খিলাফতের পতনের পর সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো ষষ্ঠ পর্ব শুরু করে। মুসলিম জাহানকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে তারা নিজেদের দেশে ফিরতে শুরু করে।

বিশৃঙ্খলা অব্যাহত রাখার কৌশল

মুসলিম রাষ্ট্রগুলো যেন নিয়মিত একের পর এক ভাঙনের শিকার হয়, সেই প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতেই সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করে—

১. **জাতিসংঘের থাবা :** জাতিসংঘের পরোক্ষ মদদে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো মুসলিমবিশ্বের অনেকগুলো সমস্যাকে এমনভাবে জটিলতর বানিয়ে রেখেছে যে, সেগুলোর সমাধান বের করা কোনোদিন সম্ভব নয়।

২. **আন্তর্জাতিক আইন :** জাতিসংঘের মাধ্যমে মুসলিম জাহানের ওপর তারা এমন কিছু আইন চাপিয়ে রেখেছে, যেগুলোকে মুখে বলার সময় যদিও আন্তর্জাতিক আইন নামে বলে বেড়ায়; কিন্তু সেগুলোর ব্যবহারিক প্রয়োগ কেবলই মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর ওপর হয়ে থাকে।

৩. **চুক্তি :** সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো কখনো জাতিসংঘের মধ্যস্থতায়, কখনো সরাসরি মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের চুক্তিতে স্বাক্ষর করিয়ে রাখে। যেগুলোর কারণে পারস্পরিক কলহ জিইয়ে রাখা হয়।

৪. **মুসলিমদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া যুদ্ধ :** মুসলিম জাহানের ওপর শক্তিমত্তা প্রদর্শন করতে এবং তাদেরকে হরদম পরাজিত মানসিকতায় আতঙ্কিত রাখতে সময়ে-অসময়ে তাদের ওপর বিভিন্ন যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়া হয়।

৫. **বিভিন্ন প্লাটফর্ম :** তারা অনেকগুলো প্লাটফর্ম বানিয়ে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোকে সেই প্লাটফর্মের মাঝে বিভক্ত করে রেখেছে, যেন এক প্লাটফর্মের মুসলিম রাষ্ট্র অন্য প্লাটফর্মের মুসলিম রাষ্ট্রকে নিজেদের প্রতিপক্ষ মনে করে।

৬. **মুসলিম জাহানে লেলিয়ে দেওয়া যুদ্ধ :** মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর পরস্পরে যুদ্ধ বাঁধিয়ে রাখা হচ্ছে। এমনকি রাষ্ট্রগুলোর ভেতরে গৃহযুদ্ধের আগুনও উস্কে দেওয়া হচ্ছে।

৭. **নিরাপত্তা :** সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো বেশ কিছু মুসলিম রাষ্ট্রে নিরাপত্তার নামে সৈন্য মোতায়েন করে রেখেছে। মূলত এগুলো হলো বন্ধুত্বের ছদ্মবেশে শত্রুতাবৃত্তি।

৮. **গণতন্ত্রের সম্প্রসারণ ও পুতুল সরকার :** মুসলিম রাষ্ট্রগুলোতে গণতন্ত্রচর্চার নামে সেখানে তারা নিজেদের এজেন্ট ও পুতুল সরকার প্রতিষ্ঠা করে রেখেছে। যাদের মাধ্যমে সহজেই তারা ওই রাষ্ট্র থেকে নিজেদের স্বার্থ হাতিয়ে নিচ্ছে।

৯. **রাজনৈতিক ও ভাষাকেন্দ্রিক দলের পৃষ্ঠপোষকতা :** আপনি দেখতে পাবেন, মুসলিম দেশগুলোতে নিত্য নতুন রাজনৈতিক ও ভাষাকেন্দ্রিক

দল-উপদল গড়ে উঠছে। ভাষা ও রাজনীতির নামে এভাবে বিভাজন গড়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা সাম্রাজ্যবাদীদের মোক্ষম কৌশল।

১০. **ভাষা ও দেশভিত্তিক সাম্প্রদায়িকতা :** প্রতিটি মুসলিম রাষ্ট্রকে ভাষা ও আঞ্চলিকতার ভিত্তিতে বিভাজিত করার জন্যে সেখানে এমন সব সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান দাঁড় করিয়ে দেওয়া হচ্ছে, যারা সেখানে ভাষা ও আঞ্চলিকতা কেন্দ্রিক সাম্প্রদায়িকতা প্রচার করবে।

১১. **ধর্মীয় ফেরকাগুলোর পৃষ্ঠপোষকতা :** যখনই কোনো সংগঠন নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আবির্ভূত হয়, এমন প্রতিটি সংগঠনকে তারা সমর্থন জোগায়।

১২. **জাল নেতৃত্ব তৈরি করা :** সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর নেতৃত্ব নিজেদের করতলগত রাখার হীন উদ্দেশ্যে সেখানে তাদের আশির্বাদপুষ্ঠ লোকদের প্রস্তুত রাখে।

এই অভ্যন্তরীণ ও পারিপার্শ্বিক বিচ্ছিন্নতার কারণে মুসলিম জাহান নিজেদের অধিকার আদায়ের দাবীতে এখন পর্যন্ত এক প্লাটফর্মে সম্মিলিতভাবে আত্মপ্রকাশ করতে পারেনি।

সপ্তম স্তর

মুসলিম জাহানের স্বাতন্ত্র্য বিনাশ

মুসলিম জাহানের স্বতন্ত্র পরিচিতি ধ্বংস করার জন্যে তারা বেশ কিছু কৌশল প্রয়োগ করে থাকে। যেমন,

১. **বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী চিন্তাবিদ তৈরি করা।** এমন চিন্তাবিদদের প্রতিষ্ঠিত করা হচ্ছে, যাদের মাধ্যমে ইসলামের আত্মা নিঃশেষ করা যাবে। এরা মানুষকে দ্বীনের নামেই দ্বীন থেকে দূরে সরিয়ে নেয়।

২. **সাম্রাজ্যবাদের আনুগত্যের মুহুর্মুহু উপদেশ।** এই তথাকথিত ইসলামি চিন্তাবিদ ও সমাজ সংস্কারকগণ নিজেদের গবেষণা ও ফতোয়ার মাঝে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর আনুগত্য করার দীক্ষা দিয়ে বেড়ায়।

৩. **ভুল ও বিভ্রান্তিকর অপব্যাখ্যার মাধ্যমে জিহাদের মনোভাব নিঃশেষ করা।** সাম্রাজ্যবাদের বিষ উপড়ে ফেলার সবচেয়ে মোক্ষম হাতিয়ার হচ্ছে জিহাদ। এজন্যে সাম্রাজ্যবাদের সেবাদাস ও আদর্শিক শিষ্যরা জিহাদের মনোভাব দূর করার পেছনে পূর্ণ শক্তি ব্যয় করে থাকে।

৪. **ইসলামি আকিদা-বিশ্বাস বিকৃত করে সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থের অনুকূলে নিয়ে আসা।** ইসলামের মূল অবয়ব বিকৃত করে তা সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থের অনুগত রূপে ও অবয়বে প্রতিষ্ঠা করা।

৫. **গণতান্ত্রিক চিন্তাধারার বিকাশ।** ইসলামি সংবিধান ধ্বংস করা এবং ধর্মহীন চিন্তাধারা ও ধর্মবিরুদ্ধ মতবাদ প্রতিষ্ঠা করার কাজটি তারা সবসময় গণতন্ত্রমনাদের মাধ্যমে হাসিল করে থাকে।

৬. **মুসলিম ঐতিহ্যের মূলে কুঠারাঘাত করা।** সাম্রাজ্যবাদীরা মুসলিমদের স্বতন্ত্র পরিচয় ধ্বংস করার জন্যে অব্যাহতভাবে ইসলামি ঐতিহ্য, সংস্কৃতি এমনকি ধর্মের যৎকিঞ্চিৎ আবহ বহন করে— এমন প্রতীকগুলোও বিকৃত করার কাজে সার্বক্ষণিকভাবে নিয়োজিত রয়েছে।

বুদ্ধিবৃত্তিক ক্রুসেডের তৃতীয় ক্ষেত্র

العولمة [আল-আওলামা] বা বিশ্বায়ন
(Globalization)

মার্কিন ও ইহুদি সাম্রাজ্যবাদ ও প্রাচ্যবাদ

বিশ্বায়ন হলো প্রাচ্যবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের নতুন সংস্করণ। যার নেতৃত্ব আমেরিকা ও ইহুদি লবির হাতে। গ্লোবালাইজেশন বা বিশ্বায়ন হলো এমন এক আন্দোলন, যার লক্ষ্য হলো— অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক, ধর্মীয়, জাতীয় ও দেশভিত্তিক স্বাতন্ত্র্য ধ্বংস করে গোটা পৃথিবীকে ইহুদি লক্ষ্য ও মার্কিন দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে নতুন পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার অধীনে নিয়ে আসা।

মুসলিম বিশ্বই কেন বিশ্বায়নের আসল লক্ষ্য?

যদিও সমগ্র পৃথিবীর উপরই বিশ্বায়ন চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে; কিন্তু এর আসল লক্ষ্য হলো মুসলমান ও ইসলামি জাহান। এর নেপথ্যে চারটি কারণ রয়েছে—

১. পুরো পৃথিবীতে ইসলামি রাষ্ট্রগুলো ভৌগলিক দৃষ্টিকোণ থেকে সর্বোত্তম অঞ্চলগুলোতে অবস্থিত।

২. মুসলিম জাহান বিস্ময়কর খনিজ সম্পদে টইটুম্বর হয়ে আছে।

৩. পৃথিবীর তিনটি বৃহৎ ধর্ম ইসলাম, খ্রিস্টবাদ ও ইহুদিধর্মের পুণ্যভূমিগুলো মুসলিম জাহানে অবস্থিত।

৪. বিশ্বায়ন মুকাবিলা করার সক্ষমতা একমাত্র ইসলামেরই রয়েছে। তাই তারা বিশ্বাস করে যে, বিশ্বায়নের পথে হুমকি হওয়ার ক্ষমতা ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্মের নেই।

গ্লোবালাইজেশনের চারটি ক্ষেত্র

বর্তমান সময়ে চারটি ক্ষেত্রে বিশ্বায়নের ধারণা ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে—

১. রাজনৈতিক গ্লোবালাইজেশন
২. অর্থনৈতিক গ্লোবালাইজেশন
৩. সাংস্কৃতিক গ্লোবালাইজেশন
৪. সামাজিক গ্লোবালাইজেশন

১. রাজনৈতিক গ্লোবালাইজেশন

আমেরিকা প্রথমে মহাদেশ উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার মূল অধিবাসী (রেড ইন্ডিয়ান)-দের কাছ থেকে তাদের অঞ্চল ছিনিয়ে নেয়। এরপর উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নিজেদের সীমারেখার বাইরে এসে বর্বরতার অনিঃশেষ ধারাবাহিকতা শুরু করে। জাপান, ফিলিপাইন, কিউবা, কম্বোডিয়া, ভিয়েতনাম, হাইতি, লেবানন ও লিবিয়াতে ধ্বংসযজ্ঞ পরিচালনা করে। ১৯৪৫ সালে জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকি শহরের ওপর পারমাণবিক বোমার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ ঘটায়। আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব ও সহায়ক উপকরণের সমাহার দেখে ইহুদি গোষ্ঠী রাজনৈতিক বিশ্বায়নের উদ্দেশ্যে আমেরিকাকে পুরোপুরি ব্যবহার করতে শুরু করে। রাজনৈতিক বিশ্বায়ন বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যেই আমেরিকার ইহুদি পুঁজিপতিরা 'লিগ অফ নেশন্স' ও 'জাতিসংঘ' প্রতিষ্ঠা করে। ২৪ অক্টোবর ১৯৪৫ সালে জাতিসংঘের ইশতিহার ঘোষণা করা হয়। জন্মের পর থেকে অদ্যাবধি এ প্রতিষ্ঠানটি রাজনৈতিক বিশ্বায়নের মূলকেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

নিউওয়ার্ল্ড ওর্ডার

আফগানিস্তানে সেভিয়েত ইউনিয়নের শোচনীয় পরাজয় ও সমাজতন্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গি মুখ থুবড়ে পড়ার পর ১৯৯১ সালে আমেরিকার পক্ষ থেকে নিউ ওয়ার্ল্ড ওর্ডার রাজনৈতিক বিশ্বায়নের সূচনা ঘটে। ১৯৯৫ সালে আমেরিকায় অনুষ্ঠিত একটি কনভেনশনে আনুষ্ঠানিকভাবে গ্লোবালাইজেশনের ঘোষণা দেওয়া হয়।

২. অর্থনৈতিক গ্লোবালাইজেশন

বিশ্বায়নের দ্বিতীয় ক্ষেত্র হচ্ছে অর্থনীতি। অর্থনৈতিক গ্লোবালাইজেশনের লক্ষ্য হচ্ছে, পৃথিবীর সবগুলো অর্থব্যবস্থার ওপর একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে গুটিকয়েক পুঁজিপতির হাতে গোটা অর্থব্যবস্থা কুক্ষিগত করা।

এই উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে চারটি পদক্ষেপ নেওয়া হয়—

১. স্বর্ণের সবগুলো ভাণ্ডার দখল করা।
২. আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা।
৩. আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক চুক্তিগুলো কার্যকর করা।
৪. মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি ছড়িয়ে দেওয়া।

প্রথম পদক্ষেপ
স্বর্ণের সবগুলো ভাণ্ডার জবরদখল

স্বর্ণের সবগুলো ভাণ্ডার দখল করা ইহুদিদের অনেক পুরনো খোয়াব। তাদের এই খোয়াব তখনই পূরণ হয় যখন স্বর্ণ-রৌপ্যের মুদ্রার স্থলে কাগুজে নোটের প্রচলন শুরু হয়। ১৯৭১ সাল পর্যন্ত সবগুলো দেশের কারেন্সি ডলারের সঙ্গে এবং ডলার স্বর্ণের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল। ১৯৭১ সালে এসে বিশ্ববাসীর হাতে শুধু কারেন্সি রয়ে গেছে। স্বর্ণের অধিকাংশ ভাণ্ডারের ওপর ইহুদিদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

দ্বিতীয় পদক্ষেপ
আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান

মার্কিন ইহুদি লবি অর্থনৈতিক গ্লোবালাইজেশনের জন্যে দ্বিতীয় বৃহৎ পদক্ষেপ হিসেবে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সংস্থা গড়ে তোলে। সেগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা হলো—

ক. ইন্টারন্যাশনাল মানিটরি ফান্ড (I.M.F—আই.এম.এফ)। এ প্রতিষ্ঠানটি হলো গোটা পৃথিবীর কেন্দ্রীয় ব্যাংক। এটি প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন রাষ্ট্রকে ৩ থেকে ৫ বছর মেয়াদে ঋণ দিয়ে থাকে।

খ. বিশ্বব্যাংক (World Bank—ওয়ার্ল্ড ব্যাংক)। এই প্রতিষ্ঠান সদস্য দেশগুলোকে দীর্ঘ মেয়াদে ঋণ দিয়ে থাকে। ঋণের মেয়াদ ১৫ থেকে ৩০ বছর পর্যন্ত হয়ে থাকে।

গ. ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন (W.T.O)। এই সংগঠনের মূল লক্ষ্য হলো, আই.এম.এফ ও বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যব্যবস্থার জন্যে বুনিয়াদি ও আইনি কার্যক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা করা।

তৃতীয় পদক্ষেপ
আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক চুক্তিগুলো কার্যকর

জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সহায়তায় মার্কিন ইহুদি পুঁজিপতিরা বহুদেশের অংশগ্রহণে বিভিন্ন চুক্তিতে স্বাক্ষর করিয়ে নিয়ে থাকে। এগুলোর মাধ্যমে তারা আন্তর্জাতিক মুক্তবাণিজ্যের পরিবেশ গড়ে তোলে। আন্তর্জাতিক মুক্তবাণিজ্যের ব্যাখ্যা হলো, বিশ্বের সবগুলো দেশের বাজারের দুয়ার পুরো পৃথিবীর বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্যে অবমুক্ত থাকবে। কোনো প্রশাসন কোনো বিদেশি কোম্পানির ওপর কোনো ধরনের বিধি-নিষেধ আরোপ করতে পারবে না। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৪৭ সালে গাট চুক্তি অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। যার সবচেয়ে বড় লক্ষ্য ছিলো, উৎপাদিত পণ্য নিয়ে প্রতিযোগিতা রাষ্ট্রের পরস্পরে না হয়ে, স্রেফ কোম্পানিগুলোর পরস্পরে হবে।

চতুর্থ পদক্ষেপ
মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি ছড়িয়ে দেওয়া

কয়েকটি ছোট ছোট কোম্পানি পরস্পরে যোগীভূত হয়ে একটি বৃহৎ মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির আকৃতি ধারণ করে থাকে। এই কোম্পানিগুলোর মালিকগণ তখন বাণিজ্যে পরস্পরের অংশিদার হয়ে যায়। এই কোম্পানিগুলোর কারণে স্থানীয় শিল্পগুলো ধীরে ধীরে নিঃশেষ হয়ে পড়ে এবং বৈদেশিক পণ্যগুলো গোটা পৃথিবীতে ছড়িয়ে যায়। বর্তমানে গুটিকয়েক মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি গোটা পৃথিবীর ওপর ছড়ি ঘোরাচ্ছে।

অর্থনৈতিক গ্লোবালাইজেশনের প্রভাব ও ক্ষয়-ক্ষতি

অর্থনৈতিক গ্লোবালাইজেশনের কারণে—

১. সারা পৃথিবীর ছোট ছোট কোম্পানি, স্থানীয় শিল্প-কারখানা ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের চোখে-মুখে অন্ধকার নেমে আসছে। দিনদিন তাদের ব্যবসার পরিধি সংকুচিত হচ্ছে।

২. বেকারত্বের হার বিপদজনক পর্যায়ে নেমে যাচ্ছে।

৩. নতুন শিল্প উদ্যোক্তাদের সামনে উন্নতির সবগুলো ফটক বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

৪. ভবিষ্যতে দেখা যাবে, একটি পণ্য শুধু একটি কোম্পানিই উৎপাদন করে গোটা পৃথিবীতে সরবরাহ করবে এবং তারা তাদের ওই পণ্যের যেমন ইচ্ছে মূল্য নির্ধারণ করবে।

৫. পুরো পৃথিবীর সম্পদ গুটিয়ে অল্পকয়েক ব্যক্তির হাতে চলে যাবে।

৬. আমেরিকার ইহুদি পুঁজিপতিরা বসে বসে সুদচক্রের সহায়তায় পুরো পৃথিবীর উপার্জন নিজেরা একাকী বগলদাবা করবে।

৩. সাংস্কৃতিক গ্লোবালাইজেশন

বিশ্বায়নের তৃতীয় বৃহৎ ক্ষেত্র হলো, সাংস্কৃতিক ও সভ্যতাকেন্দ্রিক গ্লোবালাইজেশন। বর্তমানে *সাংস্কৃতিক সংঘাতের আশঙ্কা* শিরোনামে কিছু কথাবার্তা প্রচার করে বিভিন্ন সংস্কৃতির পরস্পরে ভাব বিনিময় ও আলাপচারিতার পরিবেশ গড়ে তোলা হচ্ছে। অথচ এর নেপথ্যে আসল উদ্দেশ্য হলো, ইসলামসহ পৃথিবীর সবগুলো সভ্যতা ও সংস্কৃতির শেকড় উপড়ে ফেলে শুধু পশ্চিমা সভ্যতাকে পৃথিবীর ওপর চাপিয়ে দেওয়া।

সংস্কৃতির এই আক্রমণই আমাদের শেখাচ্ছে যে, পশ্চিমা পোশাক হলো উন্নত জীবনমানের পরিচয়। একই ধারাবাহিকতায় পশ্চিমা স্টাইলের খাদ্য-পানীয়ও সারা পৃথিবীতে ব্যাপকাকারে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। নারীদেরকে পশ্চিমা ফ্যাশন ও ম্যাকাপে অভ্যস্ত করে তোলা হচ্ছে। ইন্টারনেটকে সাংস্কৃতিক গ্লোবালাইজেশনের হাতিয়ার বানিয়ে এর মাধ্যমে সমাজের সর্বস্তরে চারিত্রিক অবক্ষয়, অশ্লীলতা ও নির্লজ্জতা ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে।

সাংস্কৃতিক গ্লোবালাইজেশনের অংশ হিসেবে আমেরিকান ইংলিশকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ছড়িয়ে দিয়ে, বিশেষত আরবিসহ অন্যান্য স্থানীয় ও জাতীয় ভাষাগুলোকে পরিত্যক্ত বানানোর ষড়যন্ত্রও অব্যাহত রয়েছে। বর্তমান সময়ে পুরো পৃথিবী থেকে পঞ্চাশোর্ধ স্থানীয় ভাষা হারিয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। ২৩৪টির মত সমকালীন জীবন্ত ভাষা ইতোমধ্যে কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে।

৪. সামাজিক গ্লোবালাইজেশন

সমাজ পরিবর্তনের জন্যে প্রয়োজন 'পরিবার' পরিবর্তন। আর পরিবারের সবচেয়ে সহজ শিকার নারী। এই নারীদের ব্যবহার করে প্রথমে 'পরিবার' এরপর পুরো 'সমাজ' এর নৈতিক মূল্যবোধ বিকৃত করার গোপন অপচেষ্টা অব্যাহতভাবে চলছে।

সামাজিক গ্লোবালাইজেশন ও জাতিসংঘ

সামাজিক বিশ্বায়ন ছড়িয়ে দেওয়ার জন্যে জাতিসংঘ ও এর অধীনস্থ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা বিশাল বিশাল কনফারেন্স-কনভেনশন আয়োজন করে চলেছে। জাতিসংঘের সংবিধানের ৮ নম্বর চ্যার্টারের একটি ধারায় পরিষ্কার লেখা আছে— *'জাতিসংঘ এমন কোনো বিধি-নিষেধ আরোপ করবে না, যার মাধ্যমে নারী-পুরুষের মধ্যকার সমতা কোনো অংশে ক্ষুণ্ন হবে।'*

১৯৭৯ সালে জাতিসংঘের সাধারণ কক্ষে 'নারীর বিরুদ্ধে সর্বপ্রকার বৈষম্যমূলক আচরণ বিলোপ করা' শিরোনামে একটি কনফারেন্স আয়োজন করে গোটা দুনিয়ার সমর্থন বাগিয়ে নেওয়া হয়।

কায়রো কনফারেন্স

১৯৯৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মিসরের রাজধানী কায়রোতে 'জনসংখ্যা ও উন্নতি' শীর্ষক একটি আন্তর্জাতিক কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত হয় যে, 'বৈবাহিক বন্ধন ব্যতিরেকে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করা যাবে। সমকামিতাকে খারাপ চোখে না দেখে বরং তা

সমাজে ছড়িয়ে দিতে হবে। দ্রুত বিয়ে করা খুবই খারাপ। কেননা এটি জন্মনিয়ন্ত্রণের হার বৃদ্ধি পেতে সহায়ক হয়।

ব্যাকেন কনফারেন্স

১৯৯৫ সালে ব্যাকেন নগরীতে নারী প্রসঙ্গে জাতিসংঘের চতুর্থ কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে এ সিদ্ধান্ত গৃহিত হয় যে,

> 'অল্পবয়সী ছেলে-মেয়েদেরকে যৌনস্বাধীনতা প্রদানের সুপারিশ করা হচ্ছে। আর পরিবারের এ অর্থ সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে হবে যে, দু'জন মানুষ মিলে একটি পরিবার গড়ে ওঠে। দুজন পুরুষ মিলে যেমন একটি পরিবার হতে পারে, তেমনই দু'জন নারী মিলেও একটি পরিবার হতে পারে। নারীদেরকে গৃহস্থালী কর্মকাণ্ড ত্যাগ করার ওপর উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এক্ষেত্রে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর প্রতিবাদ সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করতে হবে।'

কীভাবে গ্লোবালাইজেশনের মুকাবিলা করতে হবে?

* নারী ও শিশুদেরকে পশ্চিমা সংস্কৃতি ও ধর্মহীনতার সয়লাব থেকে বাঁচিয়ে রাখার পূর্ণ চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।
* জনগণকে সঙ্গে নিয়ে মিডিয়ার ওপর চাপ সৃষ্টি করতে হবে, যেন তারা চরিত্রবিধ্বংসী বিষয়গুলো প্রচার করার ক্ষেত্রে অধিকতর স্বাধীনতা না পায়।
* পশ্চিমা ভাষাগুলোর স্থানে আরবি ভাষা ছড়িয়ে দিতে হবে।
* বিদেশি ভাষা, বিশেষত ইংরেজির কার্যসীমা যতদূর সম্ভব সংকুচিত করে ফেলতে হবে। বিনাপ্রয়োজনে ব্যবহার করা যাবে না। নিজেদের মাতৃভাষাকে বিদেশি ভাষা ও সংস্কৃতির প্রভাব থেকে সুরক্ষিত-পবিত্র রাখতে হবে।
* বিদেশি পণ্য যথাসম্ভব বয়কট-বর্জন করতে হবে।
* দেশীয়, আঞ্চলিক ও জাতীয় স্বার্থ পেছনে ফেলে মুসলিমদেরকে এক প্লাটফর্মে একতাবদ্ধ হতে হবে।

* খিলাফত পুনরুজ্জীবনকে মূল লক্ষ্য স্থির করে, এর আলোকে যাবতীয় কার্যক্রম চালিয়ে যেতে হবে।
* এমন কিছু সংগঠন গড়ে তুলতে হবে, যা প্রচলিত নোংরা রাজনীতির কলুষ থেকে সুরক্ষিত থাকার মাধ্যমে জনগণের আস্থা অর্জন করবে।

বুদ্ধিবৃত্তিক ক্রুসেডের চতুর্থ ক্ষেত্র ■

التنصير/ التبشير/ الردة

[আত-তানসির/আত-তাবশির/আর-রিদ্দাহ]
খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করা ও ধর্ম্যচুত করা
(Christianity mission)

বাতিলপন্থীদের চূড়ান্ত লক্ষ্য الردة [আর-রিদ্দাহ] অর্থাৎ মুসলিমদের ইসলাম থেকে বের করা, ধর্মচ্যুত করা। এই ময়দানে সবচেয়ে বিস্তৃত পর্যায়ে কাজ করছে খ্রিস্টান মিশনারিরা। এজন্যে আমরা এখন খ্রিস্টধর্ম প্রচারের বিষয়টি নিরীক্ষণ করব। যাকে আরবিতে التنصير/التبشير ও ইংরেজিতে (Christianity mission) বলে।

التنصير [আত-তানসির] এর সংজ্ঞা

> التنصير/التبشير দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এমন আন্দোলন, যার লক্ষ্য অখ্রিস্টান জাতি-গোষ্ঠীকে খ্রিস্টধর্মে প্রবিষ্ট করা।

যারা এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত তাদেরকে মিশনারি বলা হয়। এরা নিজেদের এই আন্দোলনকে التنصير না বলে التبشير বলে থাকে। তারা বাহ্যিকভাবে এ কথা বোঝানোর চেষ্টা করে যে, আমরা মানুষকে হতাশা ও অন্ধকার থেকে বের করে নাজাতের সুসংবাদ দিই।

খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিতকরণের ইতিহাস

খ্রিস্টধর্মে ধর্মান্তরকরণের তৎপরতার শেকড় খুঁজলে দেখা যায়, আজ থেকে প্রায় পাঁচশ বছর পূর্বে এর সূচনা। এই তৎপরতাকে আমরা দুটি অংশে ভাগ করে দেখতে পারি—

১. বলপ্রয়োগপূর্বক খ্রিস্টান বানানোর যুগ।
২. প্রচার ও উৎসাহের মাধ্যমে খ্রিস্টধর্ম প্রসারের যুগ।

১. বলপ্রয়োগপূর্বক খ্রিস্টান বানানোর যুগ

পেশী শক্তি প্রয়োগ করে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করার কার্যক্রম সর্বপ্রথম স্পেনে শুরু হয়। ইসলামি আন্দালুসের পতনের সাথে সাথেই স্পেনের রাজা সেখানকার স্থানীয় মুসলিমদের ওপর বলপ্রয়োগ করে খ্রিস্টান বানাতে শুরু করে। পর্তুগালে রাজা *ম্যানুয়েল* একই রকম তৎপরতা দেখিয়েছিল। আফ্রিকার অনেকগুলো রাষ্ট্রের মুসলমানের ওপর সে এ ধরনের ঘৃণ্য সিদ্ধান্ত প্রয়োগ করে।

২. প্রচার ও উৎসাহের মাধ্যমে খ্রিস্টধর্মের প্রসার

প্রচারের মাধ্যমে ধর্ম ছড়িয়ে দেওয়ার কাজ সর্বপ্রথম প্যারিসের সেন্ট মেরি গির্জার সাত শিক্ষার্থী শুরু করে। তারা ১৫ আগস্ট ১৫৩৭ সালে খ্রিস্টধর্ম ছড়িয়ে দেওয়ার শপথ নিয়ে (Jesuit) নামে একটি ক্রিশ্চিয়ান সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে। সংগঠনটির প্রধান প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে—

১. রোমান ক্যাথলিক চার্চের বিশ্বাস অনুসারে খ্রিস্টধর্ম প্রচার করা।
২. গির্জার মর্যাদা বহাল রাখার জন্যে সন্ন্যাসবাদ ও দারিদ্র প্রচার করা।
৩. বিভিন্ন স্থানে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তৈরি করে সেগুলোকে ক্যাথলিক ধর্মের শিক্ষা-দীক্ষার চর্চাকেন্দ্র বানানো।

এভাবেই আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয় খ্রিস্টধর্মে ধর্মান্তরকরণের নতুন তৎপরতা। যার সূচনা হয় পর্তুগাল ও স্পেনে। এরপর ইউরোপিয়ান সাম্রাজ্যবাদের হাত ধরে মিশনারিদের ছোট ছোট দলগুলো মুসলিম রাষ্ট্রগুলোতেও পা ফেলতে শুরু করে।

ভারতবর্ষে মিশনারি তৎপরতার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

ভারতবর্ষে মিশনারিদের আগমন শুরু হয় মোঘলসম্রাট আকবরের শাসনামলে। তাদের ধর্মপ্রচার দেখে আকবর এতোটাই প্রভাবিত হয় যে, সে তাদেরকে গির্জা তৈরির অনুমতি দিয়ে বসে। পরবর্তীকালে সম্রাট

জাহাঙ্গিরও আগ্রা ও লাহোরে গির্জা স্থাপন ও তত্ত্বাবধানের জন্যে জমি বরাদ্দ দেয়। এই মিশনারিরা তখন পূর্ণ শক্তি ব্যয় করে এই চেষ্টা শুরু করে যে, মোঘল পরিবারের শাহযাদারা যেন খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হয়।

সম্রাট শাহজাহান যেহেতু হযরত শায়খ আহমদ সেরহিন্দি মুজাদ্দিদে আলফে সানি রহ.-এর আন্দোলনে প্রভাবিত ছিলেন, এজন্যে তিনি সর্বপ্রথম মিশনারিদের অপতৎপরতা থামিয়ে দেন। আওরঙ্গজেব রহ.-এর যুগেও মিশনারিদের অপতৎপরতা বন্ধ ছিল। কিন্তু তাঁর ইনতিকালের পর এরা আবার তৎপর হয়ে ওঠে। মোঘলসাম্রাজ্যের পতনের পর মিশনারিরা তাদের কাজের পরিধি বিস্তৃত করে। ১৮৩৪ সালে 'ওয়েস্টার্ন ফার্ন মিশন' পাঞ্জাবের শিখ রাজা নজত সিংয়ের অনুমতি নিয়ে পাঞ্জাবে কাজ শুরু করে দেয়। ১৮৩৫ সালে 'চার্চ অফ স্কটল্যান্ড' ও ১৮৫১ সালে 'চার্চ মিশনারি সোসাইটি'সহ আরো অনেকগুলো সংগঠন কাজ শুরু করে দেয়। ১৮৫৭ সালর পর দখলদার ইংরেজরা মুসলমান নবাবদের হাত থেকে বড় বড় জমিদারি ছিনিয়ে নিয়ে মিশনারি সংগঠনগুলোর হাতে তুলে দেয়। ওই যুগে নির্মিত কয়েকটি বিখ্যাত চার্চের নাম হলো,

* সেন্ট মেরি চার্চ লাহোর
* সেন্ট জন চার্চ, ঝিলম
* হোলি ট্রিনিটি চার্চ, শিয়ালকোট
* ক্রিস্ট চার্চ, রাওয়ালপিন্ডি
* সেন্ট লুকা চার্চ, এবেটাবাদ
* সেন্ট জন চার্চ, বিন্নূ।

মাঠপর্যায়ে কর্মরত কিছু খ্রিস্টান মিশন

ভারতীয় উপমহাদেশে ডজনেরও অধিক মিশনারি সংগঠন মাঠপর্যায়ে কর্মতৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। প্রেস বায়ট্রিন গোষ্ঠী, দ্যা এসোসিয়েট রিফার্মড প্রেস বায়ট্রিন চার্চ (আই.আর.পি) সলুলেশন আর্মি বা মুক্তি ফৌজ, দ্যা আফগান বর্ডার ক্রুসেড (আই.বি.সি) ও দ্যা চার্চ অফ ক্রিস্ট।

পাকিস্তানে কর্মতৎপর মিশনারিদের সম্পর্ক ইংল্যান্ড, আমেরিকা, সুইজারল্যান্ড, জার্মানি, হল্যান্ড, বেলজিয়াম, ইটালি ও স্কটল্যান্ডের সঙ্গে। চারটি প্রদেশের বিভিন্ন নগরীতে অনেকগুলো মিশনারির 'বাইবেল স্কুল' কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। বড় পরিসরে খ্রিস্টবাদ সম্পর্কিত বই-পত্র বিলি করা হচ্ছে। দেশজুড়ে ১৭টি বিশালাকারের মিশন হাসপাতাল সেবা দিয়ে যাচ্ছে। অধিকাংশ মিশনারি প্রতিষ্ঠানকে পাকিস্তান সরকার ট্যাক্স অবমুক্ত রেখে নির্বিঘ্নে কাজ করার সুযোগ করে দিচ্ছে।

ধর্মান্তরকরণের বিভিন্ন স্তর

মিশনারিদের তৎপরতাকে পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তারা তিনটি গুরুত্বপূর্ণ স্তরে কাজ করে থাকে—

১. মুসলিমদের আকিদা ও আমল দুর্বল করা।
২. মুসলিমদেরকে ইসলামের বলয় থেকে বের করে আনা।
৩. মুসলিমদের সরাসরি খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করা।

ধর্মান্তরকরণের মাধ্যম

মুসলিমদেরকে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করার এই তৎপরতায় যেই গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যমগুলো ব্যবহৃত হয় সেগুলোর একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা আপনাদের সামনে তুলে ধরছি-

১. **স্কুল, কলেজ ও ইউনিভার্সিটি**। তারা মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর বড়-ছোট সব শহরেই মিশন স্কুল খুলছে। মুসলিম শিশুদের বৃহদাংশ এই ক্রিশ্চিয়ান স্কুল থেকেই প্রতিপালিত হয়ে বের হচ্ছে।

২. **প্রিন্টমিডিয়া**। খ্রিস্টান মিশনারিরা ইসলামি নাম দিয়ে অজস্র পত্রিকা, ম্যাগাজিন ও বই-পত্র বের করছে। তাদেরই বের করা একটি পত্রিকার নাম "المجلة الاسلامية"। আরেকটি পত্রিকার নাম, 'মুসলিম ওয়ার্ল্ড'।

৩. **ইলেক্ট্রনিক্স মিডিয়া**। মিশনারিদের হাতে অনেকগুলো রেডিও ও টিভি স্টেশন রয়েছে। ইসলামি নাম দিয়ে তারা কয়েক শ ওয়েবসাইট বের করে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। সেগুলোতে তাদের প্রচারণার ধরণ খুবই মনোলোভা।

৪. **শিক্ষাপ্রতিনিধি**। মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর মেধাবী শিক্ষার্থীদের তারা ইউরোপ, আমেরিকার বিভিন্ন শিক্ষা সেমিনারে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। সেখানে তারা খ্রিস্টান চিন্তাবিদদের লেকচার শুনে প্রীত হচ্ছে। কেউ কেউ প্রভাবিত হচ্ছে।

৫. **মিশন হাসপাতাল, চিকিৎসা ও জনকল্যাণমূলক সেবা**। মিশনারি প্রতিষ্ঠানগুলো বিভিন্ন শহরে হাসপাতাল ও চিকিৎসা সেবাকেন্দ্র চালু করছে। হাসপাতালগুলোর ওয়েটিংরুমে টেবিলের ওপর খ্রিস্টধর্মের আহ্বান সম্বলিত ছোট ছোট বই সাজিয়ে রাখে।

৬. **বাইবেল লেটার কোর্স**। ঘরে বসে ধর্মীয় তথ্য জানতে ও দৃষ্টিনন্দন বইপত্র পাওয়ার লোভ দেখিয়ে তারা বাইবেল লেটার কোর্স চালু করেছে।

৭. **রোগমুক্তির জন্যে প্রার্থনাসভা**। বিভিন্ন স্থানে (সাধারণত চার্চে) প্রার্থনাসভার আয়োজন করছে। সেখানে মুসলিমগণ অংশগ্রহণ করে দেখতে পাচ্ছে যে, চোখের সামনে অন্ধ ও বধিররা স্রেফ যিশুর কাছে প্রার্থনা করেই সুস্থতা লাভ করছে। যা দেখে তারা বিস্মিত হচ্ছে। অথচ এগুলো তাদের লোকদেখানো নাটক মাত্র।

মুসলিমদের তিনটি দুর্বলতা

এ কথা অস্বীকার করার সুযোগ নেই যে, মুসলিমবিশ্বের তিনটি বড় আকারের দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে খ্রিস্টান মিশনারিরা নিজেদের লক্ষ্য পূরণে সফল হচ্ছে—

১. দারিদ্র
২. অজ্ঞতা
৩. রোগ-ব্যাধি।

মিশনারিদের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য

মিশনারিদের প্রচার তৎপরতার মাঝে নিম্নের বিষয়গুলোর ওপর জোর দেওয়া হয়ে থাকে—

১. ইসলামি আকিদা ধ্বংস করা ও ত্রিত্ববাদ প্রমাণিত করা।

২. ইসলামধর্মের ওপর থেকে আস্থা উঠিয়ে ফেলা।
৩. কুরআন কারিমের মাঝে বিকৃতি, অর্থের পরিবর্তন করা এবং মুসলিমদেরকে কুরআন থেকে দূরে সরিয়ে রাখা।
৪. মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াত ও রিসালাতকে প্রশ্নবিদ্ধ করা।
৫. মুসলিম জাহানের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করার জন্যে ইসতিশরাক (প্রাচ্যবাদ) ও সাম্রাজ্যবাদকে সহায়তা করা।

মিশনারিদের জন্যে পথনির্দেশনা ও প্রশিক্ষণের কারিকুলাম

মিশনারি প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের ধর্মপ্রচারক ও সদস্যদেরকে শতভাগ প্রশিক্ষিত করে প্রেরণ করে থাকে। তাদের প্রশিক্ষণমূলক স্কুলগুলোর কারিকুলামে প্রথম বছরেই বিভিন্ন মুসলিম ফেরকা ও তাদের পারস্পরিক মতবিরোধ বিস্তারিতভাবে শেখানো হয়। ইসলামের পূর্ণ ইতিহাসেরও পাঠ দেওয়া হয়। এছাড়া মিশনারিদের প্রশিক্ষণ কোর্সগুলোতে অন্যান্য যে বিষয়গুলোর ওপর ভালোভাবে দীক্ষিত করে তোলা হয়, তার কয়েকটি এখানে তুলে ধরছি—

১. এমন আবেগভরা বইপত্র পড়ানো হয়, যা মানবহৃদয়ে গভীর আবেদন সৃষ্টি করে। সেখানে 'গুনাহমুক্তি' ও 'নাজাত'-এর ওপর যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করা হয়।

২. ইসলামের সুন্দর সুন্দর বিষয়গুলো চয়ন করে শেখানো হয় যে, এগুলোর পূর্ণ রূপ ইঞ্জিলে আছে।

৩. কুরআন কারিমের মাঝে তাদের দৃষ্টিতে যেই ভালো ভালো উদ্ধৃতি রয়েছে, সেগুলোকে উপস্থাপন করা বলা হয় যে, কথাগুলো ইঞ্জিলের মাধ্যমে পরিপূর্ণতা পেয়েছে।

৪. তাদের শেখানো হয় যে, মানুষ হলো সোশ্যাল বা সামাজিক ব্যক্তিত্ব। কাজেই তাদের প্রভু সোশ্যাল মানে আমাদের সমাজেরই একজন হবেন। এ কারণেই একজন সোশ্যাল প্রভু তিন প্রভুর মাঝে প্রকাশ পেয়েছেন।

৫. এ কথা প্রচার করা হয় যে, বলুন, একজন 'জীবিত উদ্ধারকারী' উত্তম, না-কি একজন 'মৃত নবী' উত্তম?

৬. মুসলিমদের মাঝে তারা আলাপ শুরু করে এমন কিছু বিষয় দিয়ে, যেগুলোর সত্যতা সর্বজনস্বীকৃত। যেহেতু প্রথমেই আল্লাহর ছেলে বা ত্রিত্ববাদ নিয়ে আলোচনা তুললে বিতর্ক সৃষ্টি হবে, এজন্যে প্রথমেই এগুলো তোলে না। তারা প্রথমে নিজেদের কথার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করার জন্যে মসিহের বিস্ময়কর জন্ম, নবুওয়াত ও মসিহি জীবন সম্পর্কে কথা বলে একটা সাগ্রহ পরিবেশ সৃষ্টি করে। এগুলো ইসলামধর্মের আলোকেও সত্য কথা। এভাবে পরিবেশ সৃষ্টির পর ধীরে ধীরে শ্রোতাদের দৃষ্টি 'আল্লাহর ছেলে' এর দিকে এমনভাবে ঘোরাতে শুরু করে যে, সবাই সহজে ধরতে পারে না।

৭. হযরত ঈসার নামের সঙ্গে তারা মুসলিমদের মতো 'হযরত' শব্দ ব্যবহার করে। তারা কুরআনকেও 'কুরআন শরিফ' বলে। জনসম্মুখে কুরআনের প্রতি পরম ভক্তি দেখায়। কখনই তারা অপবিত্র বা অসম্মানজনক স্থানে কুরআন রাখে না। অর্থাৎ মুসলমান মন্দ ভাবতে পারে, এমন প্রতিটি আচরণ থেকে নিবৃত্ত থাকে।

৮. প্রত্যেক মিশনারির আবশ্যিক দায়িত্ব হলো, তাকে অবশ্যই ত্রিশ থেকে পঞ্চাশটি আয়াত সঠিক উচ্চারণে, তাফসির সহকারে মুখস্থ করতে হবে। সময়-সুযোগমত তারা মুসলিমদের সামনে সেগুলো পাঠ করে থাকে।

মিশনারি তৎপরতা প্রতিহত করার উপায়

এক্ষেত্রে আমরা কিছু সুপারিশ তুলে ধরছি—

* উলামায়ে কেরাম ও চিন্তাবিদদের কর্তব্য হবে, তারা অবশ্যই সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর কারিকুলামে 'চিন্তাযুদ্ধ', খ্রিস্ট ও ইহুদি ধর্ম ও আধুনিক আন্দোলনগুলোর সম্যক পরিচিতি অন্তর্ভুক্ত করবেন।

* যেসকল আলেম খ্রিস্টধর্মের বিরুদ্ধে মাঠে-ময়দানে কাজ করছেন, তাঁদেরকে মাদরাসায় আমন্ত্রণ জানিয়ে ছাত্রদের উপস্থিতিতে প্রশিক্ষণকোর্স করাবেন। একই কাজ স্কুল, কলেজ ও ইউনিভার্সিটিগুলোতেও শুরু করা দরকার। বিভিন্ন ধর্মের তুলনামূলক শাস্ত্রও কারিকুলামে অন্তর্ভুক্ত রাখা আবশ্যক।

* ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর ছাত্ররা মাসে কমপক্ষে একদিন আশপাশের এলাকাগুলোতে দাওয়াতের ফরয দায়িত্ব আদায়ের উদ্দেশ্যে বেরুবেন। অমুসলিম, বিশেষত খ্রিস্টানদের জনপদে গিয়ে প্রজ্ঞার সঙ্গে তাদের ইসলামের দাওয়াত দেবেন।

* মুসলিম ডক্টর ও চিকিৎসকসমাজের দায়িত্ব হলো, তারা নিজেদেরকে মিশনারি হাসপাতালের চিকিৎসকদের চেয়ে উত্তম প্রমাণিত করবেন। গরিব রোগীদের ফিস কমিয়ে রাখবেন। চিকিৎসার পাশাপাশি ইসলামের দাওয়াত দেওয়াকেও জীবনের লক্ষ্য স্থির করবেন। উম্মাহর অস্বচ্ছল শ্রেণির মাঝে জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডে নেতৃত্ব দেবেন।

* সমাজের বিত্তশালী ও হীতাকাঙ্ক্ষী ভাইয়েরা এমন কিছু নিরাপদ বাসস্থান গড়ে তুলবেন, যেখানে নওমুসলিম ভাইয়েরা আশ্রয় নিতে পারবে। নওমুসলিম ভাইদেরকে তাদের আত্মীয়-স্বজন ও এনজিওদের অনিষ্টতা থেকে নিরাপদ রেখে হালাল জীবিকা সহকারে শান্তিপূর্ণ জীবন অতিবাহিত করার পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা ও ব্যবস্থা করে দেবেন।

বুদ্ধিবৃত্তিক ক্রুসেডের আঁতুড়ঘরে প্রসূত
কয়েকটি আধুনিক চিন্তাধারা

أفكار الغزو الفكري

এখন আমরা এমন দুটি গুরুত্বপূর্ণ বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলন সম্পর্কে পর্যালোচনা করব, যেগুলো মুসলিমদের বিশ্বাস, দৃষ্টিভঙ্গি ও ব্যবহারিক জীবনে বিষবাষ্পের জোগান দিয়ে চলেছে। একটি হলো, العلمانية বা সেক্যুলারিজম। অপরটি হলো, التغريب বা পাশ্চাত্যকরণ।

العلمانية [আল আলমানিয়াহ]
বা সেক্যুলারিজম / ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ

العَلمانية বা (Secularism) এর সংজ্ঞা হলো—

"فَصْلُ الدِّيْنِ عَنِ الدُّوَلِ وَالْحَيَاة"

'রাষ্ট্র ও জীবন থেকে ধর্ম বিচ্ছিন্ন করা।'

অন্য শব্দে এর ব্যাখ্যা হলো, ধর্মহীনতা। সেক্যুলারিজমের উদ্ভব হয় উইরোপে, ধর্মের সংস্কার আন্দোলনের পর। ইউরোপ যখন লক্ষ্য করলো যে, খ্রিস্টধর্মের যুক্তিবিরুদ্ধ শিক্ষা জীবনের বাস্তবতার সঙ্গে খাপ খাচ্ছে না বা সঙ্গ দিতে পারছে না, তখন তারা ধর্ম ও রাষ্ট্রকে পৃথক করার সিদ্ধান্ত নেয়। তাদের পথ ধরে বৌদ্ধধর্ম ও হিন্দুধর্ম-সহ অপরাপর সকল ধর্মের অনুসারীরা এ কথা বুঝতে শুরু করে যে, তাদের ধর্ম কর্মচঞ্চল জাগ্রত জীবনকে সঙ্গ দিতে ব্যর্থ হচ্ছে। যার ফলে তারা সেক্যুলারিজমের প্রবক্তা ও অনুসারী হয়ে ওঠে। কিন্তু ইসলাম যেহেতু তার অনুসারীকে জীবন থেকে পালাতে বলে না; বরং ঘর থেকে শুরু করে রাষ্ট্র পর্যন্ত জীবনের সবগুলো ক্ষেত্রে যাবতীয় সমস্যার সমাধানের সক্ষমতা ইসলামের

রয়েছে। পৃথিবীর যেকোনো ভূখণ্ডে প্রয়োগ হওয়ার ক্ষমতা ইসলামের আছে। এ কারণে পশ্চিমা বুদ্ধিজীবিরা মুসলিম জাহানে সেক্যুলারিজম ছড়িয়ে দেওয়ার প্রয়াস জোরে-শোরে চালিয়ে যাচ্ছে।

সেক্যুলারিজমের প্রবক্তারা এই ভুল বক্তব্য মুসলিমদের মস্তিষ্কে বসিয়ে দিচ্ছে যে, ধর্ম ও দুনিয়া দুটি ভিন্ন ভিন্ন জগত। বিশ্বের অপরাপর ধর্মের মতো ইসলামও জীবনের সবগুলো চাহিদা পূরণের যোগ্যতা রাখে না। এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্যে পশ্চিমারা ওরিয়েন্টালিস্টদের শিষ্যদের বিশেষভাবে ব্যবহার করছে। তারা শরিয়াহ, সিরাহ ও ইসলামি ইতিহাস বিকৃত করে সেক্যুলারিজমকে মুসলিমদের কাছে গ্রহণযোগ্য বানানোর অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

সেক্যুলারিজমের বুনিয়াদি লক্ষ্য

মুসলিমবিশ্ব কেন্দ্র করে সেক্যুলারিজমের বুনিয়াদি লক্ষ্য হলো—

১. মুসলিমদের আকিদার মাঝে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি করা।
২. পাশ্চাত্যের ধর্মবিরুদ্ধ চিন্তাধারা ও বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি সমাজে ছড়িয়ে দেওয়া।
৩. ইসলামকে রাষ্ট্র, রাজনীতি ও সামাজিক জীবন থেকে বের করে পশ্চিমা মূল্যবোধের ধাঁচে সেক্যুলার রাষ্ট্র গঠন করা।

সেক্যুলারিজমের তিনটি বিপদজনক হাতিয়ার

সেক্যুলারিজমের হাতে তিনটি বিপদজনক হাতিয়ার রয়েছে—

১. জাহেলি সাম্প্রদায়িকতা উস্কে দেওয়া,
২. মুসলিমদের মনে যোগ্য নেতৃত্ব সম্পর্কে ঘৃণা সৃষ্টি করা,
৩. নারী স্বাধীনতা।

التغريب [আত তাগরিব]

পাশ্চাত্যকরণ

التغريب [আত-তাগরিব] এর ব্যাখ্যা হলো, 'পশ্চিমা জীবনব্যবস্থায় অভ্যস্ত করা'। এই আন্দোলন জনগণকে এ শিক্ষা দেয় যে, ধর্ম হলো একটি সেকেলে ও জীবনের সঙ্গে তাল হারানো বস্তু। যে জিনিস পঞ্চইন্দ্রীয় দিয়ে অনুভব করা যায় না, চোখ দিয়ে দেখা যায় না, মানববুদ্ধির মানদণ্ডে উত্তীর্ণ নয়, আমাদের অভিজ্ঞতার পাল্লায় যা কোনোদিন যুক্ত হয়নি, তা অবশ্যই পরিত্যাজ্য। জনগণের প্রথা, আঞ্চলিক রেওয়াজ, ধর্মীয় বিশ্বাস ও সামাজিক মূল্যবোধ— এগুলোর সবকিছুই উপরোল্লেখিত মাণদণ্ডের আওতায় পড়ার কারণে পরিত্যাজ্য।

পাশ্চাত্য নিজেও যেমন এ পথে চলছে, তেমনই গোটা পৃথিবীকেও তাদের অনুসারী বানাতে চাচ্ছে। এই আন্দোলনকেই আরবিতে تحريك التغريب [তাহরিকুত তাগরিব] বলা হয়। ইংরেজিতে 'মর্ডানিজম' ও উরদূতে 'জিদ্দাতপাসান্দি' বলা হয়।

প্রগতিশীলতার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হলো—

১. ইসলামের মূল অবয়ব বিকৃত করে নয়া ইসলাম উপস্থাপন করা।
২. মুসলিমদেরকে নিজেদের অতীত সম্পর্কে লজ্জিত করা।
৩. বর্তমান পরিস্থিতির কারণে মুসলিমদের হতাশ করা।
৪. আগামী সম্পর্কে আশাহত করা।
৫. মুসলিম উম্মাহর ব্যক্তিত্বকে ভঙ্গুর করে তোলা।
৬. আধুনিক সভ্যতাকে ছড়িয়ে দেওয়া।
৭. ইসলামি আন্দোলন ও নেতৃত্বের চরিত্রে কালিমা লেপন করা।

وسائل الغز والفكرى

বৃদ্ধিবৃত্তিক ক্রুসেডের মাধ্যম ও উপকরণ

এখন আমরা এমন কিছু মাধ্যম, উপকরণ ও হাতিয়ারের খতিয়ান তুলে ধরব, যেগুলোকে আমাদের প্রতিপক্ষ মুসলিম উম্মাহর মানসিকতা পরিবর্তনের কাজে ব্যবহার করছে। সেই মাধ্যমগুলো হলো—

১. শিক্ষাব্যবস্থা
২. মিডিয়া, প্রচারমাধ্যম
৩. তথ্যের উপকরণ
৪. রাজনীতির ময়দান
৫. সংবিধান
৬. জীবিকা ও বাণিজ্য
৭. জনকল্যাণমূক সংস্থা, এনজিও
৮. আধুনিকমনা ইসলামি চিন্তাবিদ
৯. শিল্পকলা
১০. সাহিত্য
১১. খেলাধুলা ও বিনোদন
১২. সংস্কৃতি জগতের হিরো
১৩. আঞ্চলিক কৃষ্টি-কালচার
১৪. জাহেলি সাম্প্রদায়িকতার উন্মেষ
১৫. যোগ্য নেতৃত্ব সম্পর্কে মুসলিমদের মনে ঘৃণা ছড়ানো
১৬. নারী স্বাধীনতা।

এখন আমরা প্রতিটি মাধ্যম সম্পর্কে পৃথক পৃথক শিরোনামের অধীনে আলোচনা করব।

১. শিক্ষাব্যবস্থা (Education)

আমাদের প্রতিপক্ষদের ঈর্ষণীয় বুদ্ধিবৃত্তিক অগ্রগতির উৎস হলো, শিক্ষা। তাদের বিভ্রান্তিকর চিন্তাধারা ব্যাপকাকারে ছড়িয়ে পড়ার পেছনে বুনিয়াদি ভূমিকা রেখেছে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা ও পাঠকারিকুলাম। এই আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার কারণে মুসলিম বিশ্বের বিদ্যাপীঠগুলোতে যেই গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, তার সংক্ষিপ্ত খতিয়ান আপনাদের সামনে তুলে ধরছি—

১. এখন শিক্ষকের পাঠদানের ভাষা বদলে গেছে।
২. শিক্ষার্থীর হাতের লেখার ভাষাও বদলে গেছে।
৩. বিদেশি ভাষা শেখা অপরিহার্য মনে করা হচ্ছে।
৪. ধর্মের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা-সমীহ লোপ পেয়েছে।
৫. পাঠকারিকুলামের মাঝে ধর্মহীনতা সৃষ্টিকারী উপাদান অনুপ্রবেশ করেছে।
৬. উলামায়ে কেরাম ও ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের অবমূল্যায়ন করা হচ্ছে।
৭. শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্যে নাস্তিক শিক্ষক চয়ন করা হচ্ছে।
৮. ছেলে-মেয়ে একসঙ্গে পড়াশুনা করছে।
৯. ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিধি ক্রমশ সংকুচিত হচ্ছে।
১০. দ্বীনি মাদরাসা ও আধুনিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর মাঝে ব্যবধান রচিত হচ্ছে।

শিক্ষাকারিকুলামের বৈশিষ্ট্য

শিক্ষাকারিকুলামের মাঝে আমাদের প্রতিপক্ষরা নিম্নের বৈশিষ্ট্যগুলোকে অপরিহার্য উপাদান বানিয়ে রেখেছে—

১. পশ্চিমা মূল্যবোধের প্রসারের কাজ জোরে-শোরে চলছে।

২. শিক্ষার্থীদেরকে নাস্তিক্যবাদী ও বস্তুবাদী মানসিকতায় গড়ে তোলা হচ্ছে,
৩. ইতিহাস থেকে অজ্ঞ বানিয়ে রাখা হচ্ছে, নিদেনপক্ষে ভুল ইতিহাস পড়ানো হচ্ছে।
৪. পাশ্চাত্য ও পশ্চিমা সেবাদাসদের যাবতীয় ভুল ও অতিরঞ্জন তাদের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখা হচ্ছে।
৫. ইসলামিয়াতকে নেহায়ত একটি দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে উপস্থাপন করা হচ্ছে।
৬. ভৌগলিক ও রাজনৈতিক বিভাজনকে ক্রমশ পোক্ত করা হচ্ছে।

শিক্ষাব্যবস্থার ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ

আমাদের প্রতিপক্ষরা আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার বাগডোর নিজেদের হাতে কুক্ষিগত রাখার স্বার্থে নিম্নের পদক্ষেপগুলো নিয়েছে—

১. আন্তর্জাতিক স্তরে ইউনেস্কো (Unesco) ও ইউনিসেফ-এর মতো বিশাল জ্ঞানভিত্তিক-সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান কায়েম করেছে।
২. পাশ্চাত্যের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অধীনে মুসলিম জাহানে টিচার্স ট্রেনিং কোর্স করাচ্ছে।
৩. শিক্ষাখাতে বৈদেশিক সাহায্য দিচ্ছে।
৪. মুসলিম জাহানের সবগুলো রাষ্ট্রের শিক্ষামন্ত্রণালয়ের ওপর বিদেশি শিক্ষাবিদদের শক্ত নিয়ন্ত্রণ ও পর্যবেক্ষণ রয়েছে।
৫. শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে নিয়মিত বিরতিতে বিদেশি শিক্ষক ও চিন্তাবিদদের প্রেরণ করা হচ্ছে।
৬. মেধাবী মুসলিম শিক্ষার্থীদেরকে ইউরোপে উচ্চশিক্ষার স্কলারশিপ দিচ্ছে।

আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার পরিণতি

১. আমাদের ছাত্ররা এখন নামকাওয়াস্তে মুসলিম।
২. তাদের মনে দ্বীনি শিক্ষার প্রতি অনাগ্রহ, কারো কারো মনে ঘৃণা জন্মেছে।

৩. পার্থিব শিক্ষা ও দ্বীনি শিক্ষার পথ ভিন্ন হয়ে গেছে।
৪. যত দিন গড়াচ্ছে, শাসক গোষ্ঠী ধর্ম থেকে তত বেশি দূরে সরে যাচ্ছে।
৫. মুসলিমরা এখন তাদের জ্ঞানের উত্তরাধিকার থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।
৬. জ্ঞানচর্চা, সংস্কৃতি ও রাজনীতির নেতৃত্বের বাগডোর পাশ্চাত্যের হাতে চলে গেছে।
৭. দ্বীন ও দ্বীনদার লোকদের প্রকাশ্যে উপহার, বিদ্রূপ ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা সাধারণ অভ্যাসে পরিণত হয়েছে।
৮. নতুন প্রজন্ম মানসিকভাবে পাশ্চাত্যের সেবাদাসে পরিণত হয়েছে।

২. মিডিয়া (Media)/ প্রচারমাধ্যম

মিডিয়া একটি শক্তিশালী মাধ্যম। যেকোনো রণক্ষেত্রে মিডিয়া প্রতিপক্ষ শিবিরে সীমাহীন আতঙ্ক ও অন্তর্ভেদী প্রভাব সৃষ্টি করার যোগ্যতা রাখে। মিডিয়ার ওপর যেই দৃষ্টিভঙ্গির লোকদের নিয়ন্ত্রণ থাকবে, জনগণ নির্বিবাদে সেই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করবে। লড়াই করতে হলে অবশ্যই সবগুলো অঙ্গ শক্তিশালী করেই লড়তে হবে। আমাদের প্রতিপক্ষ মিডিয়া ব্যবহার করে আমাদের সবগুলো অঙ্গের ওপর আক্রমণ শানাচ্ছে। তারা খুবই চাতুর্য্যের সঙ্গে আমাদেরকে হতাশা, মনোবলহীনতা ও বক্র দৃষ্টিভঙ্গির শিকারে পরিণত করে চলেছে।

দু' শ্রেণির মানুষ ও মিডিয়ার সংশয়বৃত্তি ও যৌনপ্রবৃত্তিমূলক অন্তর্জাল

মানুষ দু' ধরনের হয়ে থাকে—

১. যিম্মাদার ঘরানার মানুষ।
২. দায়িত্বমুক্ত মানুষ।

মিডিয়ার কাজ হচ্ছে, দায়িত্বশীল ঘরানার লোকদেরকে সংশয়ের অন্তর্জ্বালে ফাঁসানো। সংশয় ছড়ানোর কাজটি দক্ষতার সঙ্গে পালন করে

সংবাদ বিভাগ। সংবাদ বিভাগে সবসময় প্রচুর সংবাদ ও বিশ্লেষণ বিদ্যমান থাকে।

মিডিয়ার দ্বিতীয় কাজ হচ্ছে, যেসব মানুষ দায়িত্বহীন, তাদেরকে যৌনপ্রবৃত্তির নিচে তলিয়ে রাখা। ইন্টারটেইনমেন্ট (Entertainment) বা বিনোদন এ কাজটি চাতুর্য্যের সঙ্গে পালন করে। এই বিনোদনের তালিকায় রয়েছে— সঙ্গীত, নৃত্য, সিনেমা, নাটক ইত্যাদি।

ইহুদি লবি ও মিডিয়া

বর্তমানে পৃথিবীতে মিডিয়ার ওপর ইহুদিদের একচ্ছত্র আধিপত্য রয়েছে। বিখ্যাত প্রটোকোলসের তালিকার ১২ নম্বর ধারা হিসেবে এ সিদ্ধান্ত পূর্বেই চূড়ান্ত করে রাখা আছে যে, পৃথিবীর সবগুলো সংবাদমাধ্যমের নিয়ন্ত্রণ ইহুদিদের হাতে থাকবে। পৃথিবীতে যতগুলো সংবাদ এজেন্সি রয়েছে, যেমন রয়টার্স, এসোসিয়েট প্রেস, ইউনাইটেড প্রেস ইন্টারন্যাশনাল ও ফরাসি নিউজ এজেন্সি— এগুলোর সবকটির মালিকানা তাদের হাতে। মিডিয়ার ওপর ইহুদি পুঁজিপতিদের মালিকানার হার হচ্ছে ৯০%। মিডিয়া দখল করে রাখা ইহুদি ও খ্রিস্টান পলিসি নির্ধারকরা তিনটি বিষয়ের ওপর একমত—

১. খ্রিস্টান ও ইহুদি ঐক্যের মাঝে কোনোভাবেই ফাঁটল সৃষ্টি করা যাবে না।
২. সবসময় সম্ভ্রমের সঙ্গে মার্কিন রাজনীতির প্রতিনিধিত্ব করতে হবে।
৩. সবসময় পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার সাফাই গেয়ে যেতে হবে।

৩. তথ্যের উপকরণ الاعلام (Knowledge)

পৃথিবীবাসীর প্রয়োজন, এমন সবগুলো তথ্য লাভের যাবতীয় মাধ্যম-উপকরণের ওপর পাশ্চাত্যের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। কেউ যদি কোনো বিষয়ে তথ্য সন্ধান করে তাহলে সে খুবই স্বাভাবিকভাবে সে বিষয়ে পশ্চিমা লেখক, পশ্চিমা লাইব্রেরি ও পাশ্চাত্যের লেখা ইনসাইক্লোপিডিয়ায় বা তাদের কোনো ওয়েবসাইটে তথ্য পেয়ে যাবে। যার ফলে দ্রুত সাধারণ মানুষ বেদ্বীন লেখক, সাংবাদিক ও গবেষকদের

শাস্ত্রীয় দক্ষতা ও কৃতিত্বের ভক্ত হয়ে যাচ্ছে। এই মুগ্ধতা ও প্রভাবের পথ বেয়ে পরবর্তীকালে সে তাদের অন্য চিন্তাধারাগুলোর সঙ্গেও সহমত হতে শুরু করে।

৪. রাজনীতির ময়দান (Politics)

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি— এ দুটো হচ্ছে পশ্চিমা চিন্তাধারা ও মূল্যবোধ ছড়িয়ে দেওয়ার অনেক বড় মাধ্যম। যেসকল মুসলিম নেতৃবৃন্দ ইসলামের নিখাদ শাসনব্যবস্থার ওপর আস্থাশীল, তাদেরকে রাজনীতির ময়দান থেকে দখলমুক্ত করার উদ্দেশ্যেই গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। গণতান্ত্রিক রাজনীতির ময়দানে রাজনৈতিক দলগুলো দেশের বিভিন্ন নগরীর দাবি-দাওয়া, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নের প্রতিনিধিত্ব করে থাকে। একটি গণতান্ত্রিক দেশে গণতান্ত্রিক কার্যক্রম ও নির্বাচনের ওপর আস্থা পোষণকারী দলই রাজনীতির ময়দানে ভূমিকা রাখার অনুমতি পেয়ে থাকে। নির্বাচনী প্রক্রিয়ার ফলশ্রুতিতে কিছু নেতা জনগণের প্রতিনিধি হয়ে আইনসভায় আগমনের সুযোগ পান। কোথাও কোথাও আইনসভার দুটি কক্ষ হয়ে থাকে। উচ্চকক্ষকে বলা হয় পার্লামেন্ট। আর নিম্নকক্ষকে বলা হয় সিনেট। এই আইনসভায় দেশপরিচালনার জন্যে আইন প্রণয়নের কাজ নিয়মিত সম্পন্ন হয়।

৫. সংবিধান (Laws)

বাতিল দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাধারা বিস্তারের চতুর্থ বৃহৎ উৎস হলো, অনৈসলামিক সংবিধান। বর্তমান সময়ে বিশ্বের সিংহভাগ রাষ্ট্রে পশ্চিমা আইন বলবৎ রয়েছে। আদালত ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সহায়তায় সেই আইন বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। আদালত হচ্ছে এমন একটি প্রতিষ্ঠান, যেখানে দেশের প্রচলিত আইনের আলোকে বিভিন্ন বিবাদ সম্পর্কে রায় জানানো হয়। অতীতে আমাদের দেশের আদালতে শুধু ইসলামি ফিকাহর আলোকে বিচারপ্রক্রিয়া সুসম্পন্ন হতো। কিন্তু এখন পশ্চিমা আইনের প্রয়োগ হচ্ছে বিধায় ফকিহ, মুজতাহিদ, মুহাদ্দিস ও উলামায়ে কেরামের সাড়ে তেরো শ বছরের মেহনত বরবাদ হয়ে গেছে।

আদালত দেশের প্রচলিত আইন অনুসারে যেই সিদ্ধান্ত জানায়, তা প্রয়োগ করার কাজ আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী পালন করে থাকে। পুলিশ, ডেপুটি কমিশনার, গভর্নর হয়ে এর ধারাবাহিকতা রাষ্ট্রপতি পর্যন্ত পৌঁছে। এই প্রশাসনকে 'আইনের রক্ষক প্রতিষ্ঠান' বলা হয়ে থাকে; যদিও বাস্তবে তারা মূলত সেক্যুলার ও লিবারেল ব্যবস্থাপনার রক্ষকের ভূমিকা পালন করে।

৬. জীবিকা ও বাণিজ্য

জীবিকার যথাযথ সংস্থান ও সুদৃঢ় অর্থনীতি হচ্ছে যেকোনো জাতির উন্নতি ও অগ্রগতির মেরুদণ্ড। অন্যান্য সেক্টরের মতো এই সেক্টরেও শত্রুরা মুসলিম জাহানকে বেষ্টন করে রেখেছে।

৭. জনকল্যাণমূক সংস্থা, এনজিও

গোটা পৃথিবীতে পাশ্চাত্যের অজস্র সেবামূলক প্রতিষ্ঠান কাজ করে যাচ্ছে। তারা কাজের শুরুতে মুসলিমবিশ্বের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর আস্থা অর্জনের চেষ্টা করে। এক্ষেত্রে সফল হওয়ার পরই তারা তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাধারা ছড়িয়ে দেওয়ার মিশনে আত্মনিয়োগ করে থাকে।

৮. আধুনিকমনা ইসলামি চিন্তাবিদ

আধুনিকমনা ইসলামি চিন্তাবিদরা মূলত বাতিল গোষ্ঠীর বিশেষ হাতিয়ার হয়ে তাদের মিশনের সফলতার নেপথ্য সহযোগীর ভূমিকা পালন করে থাকে। তারা পশ্চিমাবিশ্বকে সন্তুষ্ট করার জন্যে ইসলামের হারামকে হালাল আর হালালকে হারাম অভিহিত করার দায়িত্ব পালন করে।

৯. শিল্পকলা

শিল্পকলা যেমন সঙ্গীত, নৃত্য, চিত্রাঙ্গণ, ভাস্কর্য— এগুলো হচ্ছে প্রবৃত্তির বিনোদনের উর্বর ক্ষেত্র। মুসলিমদেরকে ধর্ম থেকে সরিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে এই হাতিয়ারগুলো কার্যকর ভূমিকা রাখে।

১০. সাহিত্য

সাহিত্যের নামে ছেলে-মেয়ের প্রেমালাপ ও ধর্মবিরোধী পদ্য-গদ্য ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। যেসকল সাহিত্যিক ও কবি ধর্ম ও সৃষ্টিকর্তাকে নিয়ে বিদ্রূপ করতে পারে, তাদের যেকোনো কর্ম ও দুঃসাহসকে অভিনন্দন ও প্রশংসার প্লাবনে ভাসিয়ে দিতে ক্রুসেডাররা একটুও দ্বিধা করে না।

১১. খেলাধুলা ও বিনোদন

বিনোদন ও খেলাধুলার ময়দানকেও আমাদের শত্রুরা সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের হাতিয়ার বানিয়েছে। খেলাধুলার ময়দানের ঈমানবিধ্বংসী পরিবেশ নতুন প্রজন্মকে দ্বীন-ধর্ম থেকে শত ক্রোশ দূরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

১২. সংস্কৃতি জগতের হিরো

ভালো খেলোয়াড়, অভিনেতা ও শিল্পী— যারা সংস্কৃতি জগতের হিরো, তাদেরকে সমাজের সামনে আইডল হিসেবে উপস্থাপন করা হচ্ছে। অবস্থা এমন হয়ে গেছে যে, মানুষ তাদের কথাকে একজন আলেমে দ্বীনের ফতোয়া থেকেও অধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকে।

১৩. আঞ্চলিক কৃষ্টি-কালচার

পশ্চিমা বিশ্ব মিলিয়ন ডলার ব্যয় করে মুসলিমবিশ্বের মাটির নিচে হারিয়ে যাওয়া হাজার বছরের প্রত্নতত্ত্ব ও জাহেলি যুগের ভগ্নস্তূপ তুলে আনছে। উদ্দেশ্য হলো, মুসলিমদেরকে আঞ্চলিক কৃষ্টি-কালচারের শ্লোগানে মুগ্ধ করে ইসলামি ইতিহাস ও আত্মপরিচয় থেকে বিস্মৃত করবে।

১৪. জাহেলি সাম্প্রদায়িকতার উন্মেষ

জাতীয় ও দেশভিত্তিক সাম্প্রদায়িকতাকে উস্কে দিয়ে, বৈশ্বিক ইসলামি ভ্রাতৃত্বের বন্ধন ভেঙে পুরো বিশ্বকে ছোট ছোট প্লাটফর্মে বিচ্ছিন্ন করার প্রয়াস চলছে। এই বিভাজন পরবর্তীকালে ধর্মহীনতার পথ মসৃণ করে দেয়।

১৫. যোগ্য নেতা ও নেতৃত্বের প্রতি মুসলিমদের মনে ঘৃণা ছড়ানো

ধর্মবৈরী শক্তিগুলোর একান্ত অভিপ্রায় হলো, কিছুতেই যেন মুসলিমদের কাছে কোনো যোগ্য নেতৃত্ব না থাকে। এজন্যে যখনই মুসলিম সমাজে কোনো যোগ্য নেতৃত্ব উঠে আসে, সঙ্গে সঙ্গে তার বিরুদ্ধে অপপ্রচার শুরু করে। তার চরিত্রে কালিমা লেপনের কোনো কসরত তারা বাকি রাখে না।

১৬. নারীস্বাধীনতা

হাদিসে নারীদেরকে শয়তানের জাল বলা হয়েছে। পাশ্চাত্য এই জাল পূর্ণ চাতুর্য্যের সঙ্গে ব্যবহার করছে। তারা নারীস্বাধীনতার শ্লোগান তুলে নারীসমাজকে পথচ্যুত করছে। নারীদেরকে বাজারি পণ্য বানিয়ে তার নারীত্বের অপমান করছে। এরপর সেই নারীদেরকে হাতিয়ার বানিয়ে পুরুষদের পথভ্রষ্ট করছে। মুসলিমবিশ্বে নারীস্বাধীনতার শ্লোগান তোলার পেছনে তিনটি বড় ধরনের স্বার্থ রয়েছে-

১. ইসলামি চরিত্র, নৈতিকতা ও সমাজব্যবস্থা ধ্বংস করা। উন্নত চরিত্র ও পবিত্র মূল্যবোধের কারণে ইসলাম পশ্চিমাদের চক্ষুশূল। এজন্যে তারা তা বিনষ্ট করতে মরিয়া হয়ে লেগেছে।

২. ইসলামি সমাজের বৈশিষ্ট্য বিনষ্ট করা। মুসলিমদের পবিত্রতা ও চারিত্রিক নিষ্কলুষতা দেখে যেন অমুসলিমরা ইসলামের দিকে এগিয়ে না আসে, তার বন্দোবস্ত করতেই তারা ইসলামের আদর্শ সমাজব্যবস্থা তছনছ করতে বদ্ধপরিকর।

৩. মুসলিম নারীদের বাজারি পণ্যে পরিণত করার প্রাচীন খায়েশ। মুসলিম নারীরা বিগত তেরো শ বছর ধরে পর্দাবৃত আছেন। পশ্চিমাবিশ্ব নিজেদের খায়েশ পূরণ করার জন্যে মুসলিম নারীদের মন-মানসিকতা বিনষ্ট করতে আদাজল খেয়ে নেমেছে। তাহলে খুব সহজেই ওরা তাদেরকে নিজেদের জালে ফাঁসাতে পারবে।

নারীস্বাধীনতার জন্যে মিথ্যা প্রচারাভিযান

নারীস্বাধীনতার তকমা ছড়িয়ে দিতে ও মুসলিম নারীদের মানসিকতা পরিবর্তন করতে পশ্চিমা বিশ্ব অনেক দিন ধরেই মিথ্যা প্রচারাভিযান

চালিয়ে আসছে। যার সারাংশ হলো, ইসলাম নারীকে দমিয়ে রেখেছে। নারীদের ওপর ইসলাম নির্যাতন করে। প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলাম পুরুষের সঙ্গে দয়াসুলভ আচরণ করে। অথচ ইসলাম নারীর অধিকার শুধু খর্বই নয়; বরং কেড়েও নেয়।' নাউযুবিল্লাহ।

এক্ষেত্রে তারা নিম্নের বিষয়গুলো জনসম্মুখে বৃহদাকারে তুলে ধরে থাকে—

১. ইসলাম নারীকে গৃহবন্দি করে রেখেছে।
২. নারীকে স্বাবলম্বী হতে, জীবিকা উপার্জন করার জন্যে বাইরে বেরুতে নিষেধ করেছে।
৩. ইসলাম নারীদেরকে অসম্পূর্ণ বুদ্ধিসম্পন্না অভিহিত করেছে।
৪. উত্তরাধিকার সম্পত্তির মাঝে ইসলাম নারীকে পুরুষের অর্ধেক অংশ দেয়।
৫. ইসলাম শুধু পুরুষকেই তালাকের অধিকার দিয়েছে।
৬. পুরুষকে একসঙ্গে চার স্ত্রী রাখার অধিকার দিয়েছে, যা নারীকে দেয়নি।
৭. নারীর সাক্ষ্য অর্ধেক মনে করা হয়।

ওরিয়েন্টালিস্টদের বানিয়ে দেওয়া এই আপত্তিগুলো প্রচার করে মুসলিম নারীদেরকে ইসলামি মূল্যবোধ সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ করার অপচেষ্টা বিগত দেড় শতাব্দী ধরে অব্যাহত রয়েছে।

১৯১৩ সালে একটি সংঘবদ্ধ ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে এমন কিছু আধুনিকমনা মুসলিম নারীকে প্রচারের আলোয় নিয়ে আসা হয়, যারা প্রকাশ্যে মুখ থেকে নিকাব ছুড়ে ফেলে। শরীর থেকে বোরকা-চাদর তুলে বাইরে নিক্ষেপ করে। মিসরের বুকে 'হুদা শা'রাভি' হচ্ছেন প্রথম মহিলা, যিনি প্রকাশ্যে পর্দার বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলেছেন।

১৯২৩ সালে 'নারী সম্মেলন' নামে ইটালির রোম নগরীতে মহিলাদের অংশগ্রহণে একটি আন্তর্জাতিক কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে হুদা শা'রাভি বোরকা খুলে পায়ের নিচে রেখে দু' পায়ে মথিত করে ঘোষণা দেয় যে, 'আজ থেকে পর্দার প্রচলন বিলুপ্ত। পৃথিবীর যেকোনো নারী তার ইচ্ছেমত যেকোনো পোশাক পরতে পারবে।'

নারীস্বাধীনতার আড়ালে পর্দাহীনতার আহ্বান

নারীস্বাধীনতার আড়ালে পর্দাহীনতার আহ্বান পাঁচটি পর্যায়ে দেওয়া হয়-

প্রথম পর্যায় : অবগুণ্ঠন মুক্তকরণ। প্রথম পর্যায়ে নিকাব খোলা হয়। কুরআন কারিমের আয়াত ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে নারীদেরকে নিকাব-বোরকা খুলে ফেলতে উদ্বুদ্ধ করা হয়।

দ্বিতীয় পর্যায় : গায়রে মাহরাম পুরুষদের সঙ্গে অবাধ মিশ্রণ। নারীদেরকে পুরুষের সঙ্গে অবাধে উঠা-বসা করা ও বিভিন্ন আয়োজন-উৎসবে অংশগ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করা হয়। নার্সারি স্কুলে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদেরকে সহশিক্ষার পরিবেশে পাঠদানের মাধ্যমে পর্দাহীনতার ওপর অভ্যস্ত করে তোলা হয়।

তৃতীয় পর্যায় : চার দেয়ালের বৃত্ত ভাঙা। ঘরের বাইরে পা রেখে সুন্দর পৃথিবী দেখার আহ্বান জানানো হয়। এ কারণেই আধুনিকমনা মুসলিম নেতাদের স্ত্রীদেরকে উদাহরণ বানিয়ে তাদের সামনে উপস্থাপন করা হয়।

চতুর্থ পর্যায় : পুরুষের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলা। যেসব নারী সহশিক্ষার পরিবেশে বেড়ে ওঠে, তারা খুব দ্রুত পুরুষের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলতে সক্ষম হয়। শিক্ষা, বাণিজ্য ও পরিবহণ সেক্টর থেকে শুরু করে সেনাবাহিনী, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও রাজনীতির ময়দানে তারা পুরুষের সঙ্গে সমান তালে কাজ করে যায়।

পঞ্চম পর্যায় : শিল্প-সাহিত্যে নারীর আগমন। পঞ্চম পর্যায়ে এসে নারীদেরকে অধিক উপার্জন ও সুখ্যাতির লোভ দেখিয়ে মডেল, অভিনেত্রী, নৃত্যশিল্পী ও কলগার্ল বানিয়ে দেওয়া হয়।

পর্দাহীনতার মন্দ পরিণতি

পর্দাহীনতা অসংখ্য ক্ষতি বয়ে আনে। নিম্নে সেখান থেকে কয়েকটি চয়িত পয়েন্ট তুলে ধরা হলো—

১. স্বামী-স্ত্রীর মাঝে অনাস্থা ও অবিশ্বাস সৃষ্টি করে।

২. সংসার থেকে ভালোবাসার নাম-গন্ধ পর্যন্ত উঠে যায়। এ সংসারের ভালোবাসাবঞ্চিত সন্তানরা পরবর্তীকালে ছন্নছাড়া-বাউন্ডুলে হয়ে যায়।

৩. পরিবার হলো সমাজের বুনিয়াদ। যখন পরিবার বিনষ্ট হয় তখন তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতিতে সমাজও ধ্বংস হয়ে যায়।

৪. বেপর্দার পরিবেশ ও আব্রু সম্পর্কে অসচেতন সমাজ থেকে পারিবারিক বন্ধন নিঃশেষ হয়ে যায়।

পশ্চিমা সভ্যতা নারীকে কী দিয়েছে?

নারী স্বাধীনতা যে একটি অন্তসারশূন্য শ্লোগান- এ বাস্তবতা পশ্চিমাবিশ্বে এখন দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে গেছে। পাশ্চাত্যের স্ত্রীরা এখনো স্বামীদের নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। ব্যভিচারকে আইনের দৃষ্টিতে অনুমোদন দেওয়ার পরও প্রতিবছর হাজার হাজার ধর্ষণের মামলা আদালতে উত্থাপিত হচ্ছে। স্কুলপড়ুয়া মেয়েদের গর্ভবতী হওয়ার ঘটনা এতোটাই বেড়ে গেছে যে, এখন কমবয়স্ক মায়েদের জন্যে পৃথক স্কুল খুলতে হচ্ছে। এ সকল ক্ষয়-ক্ষতি দেখে ইউরোপে এখন নতুন করে একটি আন্দোলন শুরু হয়েছে যে, স্বাধীন নারীদের পুনরায় গৃহিণী বানানো হোক, যেন ইউরোপ পরিবারপ্রথা পুনরায় ফিরে পায়।

বুদ্ধিবৃত্তিক ক্রুসেড কীভাবে মুকাবিলা করতে হবে?

■ كيف نقاوم الغز والفكري؟ ■

লড়াইয়ের পূর্বে কি কি দেখতে হয়?

* আমাদের সংঘাত কাদের সঙ্গে? শত্রু কারা?
* শত্রু কোন দিক দিয়ে আমাদের ওপর আক্রমণ করছে?
* আমাদের লক্ষ্যবস্তু কী?
* কোন রণাঙ্গনে আমাদের লড়তে হবে? রণাঙ্গনটি কেমন?
* লড়াইয়ের হাতিয়ার কি কি?
* আমাদের পজিশন কেমন? অর্থাৎ আমাদের শক্তি কোথায়, যা দিয়ে আমরা আমাদের প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে লড়ব? এবং আমাদের দুর্বলতা কোথায়, যা আমাদের কাটিয়ে উঠতে হবে?
* শত্রুর পজিশন কী? অর্থাৎ তাদের শক্তি কোথায় কোথায়? দুর্বল পয়েন্টগুলোও চিহ্নিত করতে হবে। যেখান দিয়ে আমরা কার্যকর আক্রমণ করতে পারব।

সফলতার স্বপ্ন নিয়ে কোনো রণাঙ্গনে অবতরণ করার আগে অবশ্যই আমাদেরকে উল্লিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর সঙ্গে রাখতে হবে।

আমাদের দুর্বলতা

বুদ্ধিবৃত্তিক যুদ্ধের এই মুহূর্তে আমাদের এমন ১২টি বড় ধরনের দুর্বলতা রয়েছে। চতুর শত্রু সেগুলোর পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে যাচ্ছে–

১. ঈমানি দুর্বলতা
২. আমলের দুর্বলতা
৩. ইলমে দ্বীনের দুর্বলতা
৪. পার্থিব বিদ্যার দুর্বলতা
৫. সুস্থ শরীরের দুর্বলতা ও বিভিন্ন রোগ-ব্যাধি

৬. অর্থনৈতিক দুর্বলতা ও সুদি অর্থব্যবস্থা
৭. মিডিয়ার মাধ্যমে আক্রমণ করতে না পারার দুর্বলতা
৮. রাজনৈতিক দূরবস্থা
৯. সৎ ও যোগ্য নেতৃত্বের তীব্র সংকট
১০. দারিদ্র
১১. চৈন্তিক জড়তা ও নিষ্ক্রীয়তা
১২. অব্যবস্থাপনা ও বিশৃঙ্খলা।

আমাদের শক্তিমত্তা

আমাদের কিছু গুরুত্বপূর্ণ শক্তি রয়েছে। সেগুলো হলো,
১. আমরা সত্যপন্থী
২. আল্লাহর সাহায্য-সহযোগিতা
৩. মনোবল জোগানোর অঙ্গীকার
৪. বিভিন্ন ফিতনার ভবিষ্যদ্বাণী ও ভবিতব্য পরীক্ষার সংবাদ
৫. মানুষের হৃদয় জয় করার বাস্তব ক্ষমতা
৬. নিরাপদ শরিয়ত
৭. জনসংখ্যার শক্তি
৮. ভৌগলিক অবস্থান
৯. খনিজ সম্পদ

শত্রুপক্ষের দুর্বল দিক

আমাদের প্রতিপক্ষের কিছু দুর্বল দিক-
১. বাতিল বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গি
২. অস্থির প্রাণ ও সংশয়বাদী মানসিকতা
৩. অন্তসারশূন্য সমাজব্যবস্থা ও দুর্বল পারিবারিক বন্ধন
৪. মৃত্যুর ভয় ও দুনিয়ার লোভ
৫. অহমিকা, আত্মম্ভরিতা, ক্রোধ, উগ্রতা, প্রতিশোধের উন্মাদনা ও ত্বরাপ্রবণতা
৬. পতনোন্মুখ অর্থব্যবস্থা

৭. জনসংখ্যার স্বল্পতা
৮. অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা।

কাজ করার পদ্ধতি

নিজেদের দুর্বলতা এবং প্রতিপক্ষ শক্তির দুর্বলতা ও শক্তিমত্তার জায়গাগুলো অনুধাবন করার পর আমাদের কাজ শুরু করে দিতে হবে। এ পর্যায়ে এসে আমাদেরকে নিম্নের বিষয়গুলো বুঝে নিতে হবে-
১. আমাদের লক্ষ্যবস্তু কী?
২. কি কি বৈশিষ্ট্যের বাহক হয়ে আমাদের কাজ করতে হবে?
৩. কাদের ওপর কাজ করতে হবে?
৪. কোন ময়দানে আমাদেরকে প্রাধান্য বিস্তার করতে হবে?
৫. আমাদের হাতিয়ার কী হবে?
৬. কোন কোন কেন্দ্র থেকে আমাদেরকে প্রেরণাশক্তি নিতে হবে?

আমাদের লক্ষ্য কী হবে?

বুদ্ধিবৃত্তিক যুদ্ধের ময়দানে আমাদের লক্ষ্য হবে-
১. আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা।
২. বান্দাদের আল্লাহমুখী করা।
৩. নিজেদের সেসব দুর্বলতা দূর করতে হবে, যা বাতিল শক্তির সহায়ক হচ্ছে।
৪. সাম্রাজ্যবাদ, প্রাচ্যবাদ, খ্রিস্টবাদ ও বিশ্বায়নের সবগুলো আশঙ্কা প্রতিহত করা।
৫. ইসলামের বিরুদ্ধে চলমান সবগুলো ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করা।
৬. ইসলামি খিলাফাহর জন্যে সকল জনগণকে গড়ে তোলা।
৭. অমুসলিমদের ইসলামের দাওয়াত দেওয়া।
৮. শরিয়াহ কার্যকর করা ও ইসলামি সমাজব্যবস্থার একটি পূর্ণাঙ্গ উদাহরণ উপস্থাপন করা।
৯. পুরো পৃথিবীতে ইসলামের চৈন্তিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও মতাদর্শিক শ্রেষ্ঠত্ব বাস্তবায়ন করা।

কাজ করার আবশ্যিক বৈশিষ্ট্য

এ ময়দানে কাজ করার জন্যে আমাদেরকে অবশ্যই নিম্নের বৈশিষ্ট্যাবলির ধারক-বাহক হতে হবে-

১. সুদৃঢ় ঈমান,
২. একনিষ্ঠ নিয়ত,
৩. আল্লাহর অধিক যিকির,
৪. হালাল রিজিক ও সদকা-খয়রাত করা,
৫. দুনিয়ার প্রতি নির্মোহ চেতনা, অল্পে তুষ্টি ও সরল জীবন,
৬. সকল ওয়াজিব আদায় করা ও সকল নিষিদ্ধ কাজ বর্জন করা,
৭. আবশ্যিক দ্বীনি ইলম অর্জন করা,
৮. বান্দার সবগুলো হক আদায় করা,
৯. উম্মতের ফিকির,
১০. বর্তমান পরিবেশ-পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতন হওয়া এবং ইতিহাস সম্পর্কে অবহিত হওয়া,
১১. ইসতিকামাত বা অবিচলতা।

কাদের ওপর কাজ করতে হবে?

বুদ্ধিবৃত্তিক এই যুদ্ধে শত্রুপক্ষকে প্রতিহত করার ক্ষেত্রে আমরা কাদের সম্বোধন করব? কারা আমাদের কাজের ক্ষেত্র হবে—

১. আমার নিজ সত্তা,
২. ঘরের সদস্য, পরিবার-পরিজন
৩. বংশের সদস্য ও মহল্লার প্রতিবেশী
৪. দরিদ্র ও অবহেলিত শ্রেণি
৫. ধনাঢ্য শ্রেণি
৬. শিক্ষার্থী সমাজ
৭. মহিলা
৮. শিশু
৯. রোলমডেল
১০. শাসকবর্গ।

আমাদের কাজের ক্ষেত্র

এখন আপনাদের সামনে এমন কিছু ময়দানের তালিকা তুলে ধরছি, যেখানে প্রবেশ করে আমাদেরকে বুদ্ধিবৃত্তিক যুদ্ধ করতে হবে—

১. পূর্ণ ঈমান ও নেক আমলের দিকে দাওয়াতের ময়দান।
২. রাজনীতির ময়দান।
৩. অমুসলিমদের মাঝে ইসলামপ্রচারের ময়দান।
৪. দ্বীনি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা ও সেগুলোর উন্নতি সাধন।
৫. মসজিদ ও খানকাহ আবাদ করা।
৬. দ্বীনি পরিবেশে মানসম্মত প্রক্রিয়ায় আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান পাঠদানের উপযোগী বিদ্যালয়।
৭. আধুনিক শিক্ষালয়, স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটিকে সঠিক পথে উঠিয়ে আনা ও সেখানকার ছাত্র, শিক্ষক ও পরিচালকদেরকে দ্বীনের কাছাকাছি নিয়ে আসা।
৮. মিডিয়া।
৯. মুসলিম জাহানের বাণিজ্য ও অর্থব্যবস্থাকে ইসলামি সীমারেখার ওপর দৃঢ়তার সঙ্গে পরিচালনা করা ও স্বয়ংসম্পূর্ণ করা।
১০. সেবামূলক কর্মকাণ্ডের পরিধি গোটা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেওয়া।
১১. শরিয়তের সীমারেখার ভেতরে থেকে খেলাধুলা, বিনোদন এবং হৃদয়গ্রাহী ও তথ্যসমৃদ্ধ প্রোগ্রাম বেশি বেশি আয়োজন করা।

আমাদের হাতিয়ার কী হবে?

আমাদের হাতিয়ার সেগুলোই হবে, যেগুলোর আলোচনা আমরা وسائل الغزو الفكري [চিন্তাযুদ্ধের পুঁজি ও উপকরণ] অধ্যায়ে আলোচনা করেছি।

আমাদের শক্তির কেন্দ্রবিন্দু

আমাদের প্রেরণাশক্তির উৎস তিনটি—

১. মসজিদ

২. মাদরাসা
৩. খানকাহ।

এগুলোই আমাদের বুনিয়াদি কেন্দ্রবিন্দু। সকল কর্মকাণ্ডে প্রতিমুহূর্তে এই তিনটি কেন্দ্রের সঙ্গে আমাদের নিবীড় সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
প্রচলিত বিভিন্ন ধর্ম ও দৃষ্টিভঙ্গি

১. হিন্দুধর্ম
২. বৌদ্ধধর্ম
৩. ইহুদিধর্ম
৪. খ্রিস্টধর্ম
৫. বস্তুবাদ
৬. পুঁজিবাদ
৭. সমাজতন্ত্র

সনাতন হিন্দুধর্ম

হিন্দুধর্মের আদি নাম 'ব্রহ্মা'। যা হিন্দুধর্মাবলম্বীদের উপাস্য ব্রহ্মের দিকে সম্বন্ধিত। প্রাচীন সাহিত্যে 'হিন্দু' শব্দ বলে কোনো বিশেষ ধর্মের অনুসারীদের বোঝানো হতো না; বরং একটি বিশেষ ভূখণ্ডের জনগোষ্ঠী বোঝানো হতো। ওই যুগে মুসলিমরা 'হিন্দু' বলে ওই সব লোককে বোঝাতো, যারা সিন্ধ নদীর পূর্বাঞ্চলে বসবাস করতো। যেহেতু ভারতবর্ষের অধিকাংশ নাগরিক এই ব্রহ্মাধর্মের অনুসারী ছিল, এজন্যে ধীরে ধীরে ধর্মের নামই হয়ে পড়ে 'হিন্দুধর্ম'।

হিন্দুধর্ম

হিন্দুধর্মের পারিভাষিক সংজ্ঞা জানানো নেহায়েতই মুশকিল। কেননা এ ধর্মের মৌলিক বিশ্বাস সর্বসম্মতভাবে চূড়ান্ত নয়। এ ধর্মের যেমন কোনো ঐশীগ্রন্থ নেই, তদ্রূপ কোনো প্রতিষ্ঠাতা বা পয়গম্বর-অবতারও নেই। এ ধর্মের সব অনুসারীর বিশ্বাস এক নয়। পরস্পরে প্রচুর ভিন্নতা আছে। প্রমাণ হিসেবে স্রেফ কিছু উপাখ্যান, গল্প-কাহিনীই পাওয়া যায়।

হিন্দুদের মস্তিষ্ক সাধারণত চিন্তাশীল হয় না। তারা অচিন্তক মানসিকতার অধিকারী হয়ে থাকে। তাদের মানসিকতার মাঝে সন্দেহ, ভয় ও নিরাপত্তাহীনতাবোধ প্রগাঢ় থাকে। তারা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়গুলোকে চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গির ওপর এবং সন্দেহশীল বিষয়গুলোকে অভিজ্ঞতার ওপর প্রাধান্য দিয়ে থাকে। যার কারণে দেখা যায়, তারা এমন প্রতিটি বস্তুকে উপাস্য জ্ঞান করে যার সঙ্গে তাদের ভয় বা আশা সম্পৃক্ত। মাটি, আকাশ, সাগর, উদ্ভিৎ, গাভী, সাঁপ এমনকি তারা বাঁদরেরও পুঁজা করে। হিন্দুদের সবগুলো বিশ্বাসও একস্থানে সংকলিত আকারে পাওয়া যায় না। জওহরলাল নেহরুর মতো ব্যক্তিও হিন্দুধর্মমতের বিশ্বাসকে অস্পষ্ট ও অসংকলিত স্বীকার করেছেন। তিনি লিখেছেন—

> 'একটি ধর্ম ও বিশ্বাসের দৃষ্টিকোণ থেকে হিন্দুধর্মমত অস্পষ্ট, অসংকলিত ও একাধিক ধারায় বিভাজিত।'

ভারতের সাবেক প্রধান ডক্টর রাধা কৃষ্ণ লিখেছেন—

> 'হিন্দুধর্মের মাঝে অনেকগুলো মতধারা ও অনেকগুলো ধর্মের আকর্ষণ-বিকর্ষণ এতটাই জটিল, রহস্যময় ও ধূম্রজাল সহকারে নিয়মিত অনুপ্রবেশ করেছে যে, সেগুলোর পরিণতিতেই বিশেষ সভ্যতা গড়ে উঠেছে। যার ফলে এখন এ ধর্ম যেমন আর্য সভ্যতার প্রতীক নয়, তেমনই দ্রাবিড় সভ্যতারও বাহক নয়, তেমনই অন্য কোনো প্রাচীন সভ্যতারও উত্তরসূরি নয়।'

ঈশ্বরপরিচিতি

হিন্দুধর্মের মাঝে একদিকে যেমন একত্ববাদের উপস্থিতি দেখা যায়। যেমন বেদে আছে— 'ঈশ্বর হলে পুরো ব্রহ্মাণ্ডের একচ্ছত্র অধিপতি। তিনি সর্বত্র বিদ্যমান। সব কিছু দেখেন। সেই ঈশ্বর একজনই।'

তেমনই যজুর্বেদের এক মন্ত্রে আছে—

> 'তিনি সবার স্রষ্টা। তিনি নিজে কারো সৃজিত নন। তিনি নিজ সক্ষমতায় অধিষ্ঠিত।'

কিন্তু এগুলোর পাশাপাশি যে পরিমাণ শিরক হিন্দুধর্মে রয়েছে, অন্য কোনো ধর্মে তার নজির খুঁজে বের করা মুশকিল। এই শিরকের ক্ষেত্রে হিন্দুদের দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাখ্যা হলো, সমস্ত দেব-দেবী ও শক্তির সবগুলো প্রকাশস্থল যেমন, বাতাস, আগুন, সাগর— এগুলো মূলত একই মহাশক্তির বিভিন্ন রূপমাত্র। তারা মনে করে, এগুলোর পুঁজা মানে স্রষ্টারই পুঁজা। এই দৃষ্টিভঙ্গিটাই অগ্রসর হতে হতে একসময় বিবর্তনের দিকে মোড় নেয়। যার ব্যাখ্যা হলো, একই স্রষ্টা বিভিন্ন আকৃতি ও ভিন্ন ভিন্ন অবয়বে প্রবেশ করে মূর্তমান হয়ে দেখা দেন।

বিশ্বাস

হিন্দুধর্মের সবগুলো বিশ্বাসের মৌলিক নীতি তিনটি—

১. ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস।
২. বেদগ্রন্থগুলোর প্রতি বিশ্বাস।
৩. পুনর্জন্মে বিশ্বাস।

ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস রাখা-না রাখার ব্যাপারেও হিন্দুদের মাঝে দুটি সম্প্রদায় রয়েছে। একদল হলো আস্তিক, ঈশ্বরে বিশ্বাসী। অপরদল নাস্তিক, ঈশ্বরে অবিশ্বাসী। গান্ধিজির বক্তব্য হলো— 'ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস না রেখেও একজন ব্যক্তি নিজেকে হিন্দু বলতে পারেন।'

১. ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস

হিন্দুদের মাঝে উপাস্য হলো, ইন্দ্রীয়গ্রাহ্য ঈশ্বর। তাদের দৃষ্টিভঙ্গি হলো, যে বস্তু পঞ্চ ইন্দ্রীয়ের অনুভবের বাইরে, সে বস্তু পূজনীয় হতে পারে না। এই দৃষ্টিভঙ্গির কারণে হিন্দুদের সাহিত্যের মাঝে নিদেনপক্ষে ৪ কোটি ৩৫ লক্ষ সংখ্যক ব্যক্তি ও বস্তু রয়েছে, যাদেরকে হিন্দুরা নিজেদের বিশ্বাস অনুসারে দেব-দেবী বিশ্বাস করে থাকে। এই দেবতারা ভূমি ও আকাশের সমস্ত শক্তির অধিপতি; কিন্তু অজস্রবার তারা মানুষের কাছে পরাজিত হয়েছে। হিন্দুসাহিত্যে এর অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে। যেমন, রামচন্দ্রজীর ভাই লক্ষ্মণ বলেছিল,

> 'সকল দেবতা মিলে আমার ভাইকে পরাজিত করতে পারবে,
> এটা কস্মিণকালেও সম্ভব নয়।'

হিন্দুধর্মে বড় দেবতা তিনজন— ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব। এই ত্রি দেবতাকে কেন্দ্র করে তাদের ত্রিত্ববাদের বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত। এই দৃষ্টিভঙ্গিকে তারা ত্রিমূর্তি বলে। এই ত্রিত্ববাদের মাঝে সবচেয়ে বেশি ক্ষমতা ব্রহ্মার। সেই ভূমণ্ডলের স্রষ্টা। তাদের মতে, তিনিই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে এনেছেন; কিন্তু বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে সৃষ্টি করার পর এর সঙ্গে তার আর কোনো সম্পর্ক থাকেনি। যেহেতু হিন্দুদের মস্তিষ্কে পূজা-অর্চনার প্রবণতা বেশি, এজন্যে তারা ব্রহ্মাকে পূজা করে না। কেননা তিনি তো স্রেফ আত্মা।

বিষ্ণু হচ্ছেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রক্ষক। অস্তিত্ব অক্ষুণ্ন রাখার দায়িত্বশীল। তার স্ত্রী লক্ষ্মী হচ্ছেন সম্পদ ও প্রাচুর্য্যের প্রতীক। বিষ্ণু প্রয়োজনের সময়

মানবদেহে অনুপ্রবেশ করে। জন্তু-জানোয়ারের দেহেও অনুপ্রবেশ করে। এমনকি কখনো কখনো সে উদ্ভিদের আকারও ধারণ করে।

শিব বা শিবা হলো বিষ্ণুর বিপরীত সত্ত্বা। সে প্রকৃতির সমস্ত কর্মকাণ্ড তত্ত্বাবধান করে। নির্মাণ, ধ্বংস ও বিনাশের সকল শক্তির অধিকারী। হিন্দুদের অধিকাংশ সন্ন্যাসী, সাধু ও রাজনৈতিক নেতৃবর্গ এ দেবতারই অর্চনা করে। শিবের প্রতিটি নামের শুরুতে 'ওম' থাকে। শিবের মূল অস্ত্র হলো, ত্রিশূল। ভারত তাদের মিজাইলের নামকরণ করেছে এই ত্রিশূল দিয়েই।

২. বেদের ওপর বিশ্বাস

হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ হলো—

১. ঋগ্বেদ ২. পুরাণ ৩. উপনিষদ ৪. মহাভারত ৫. ভগবত গীতা ৬. রামায়ণ।

বেদ চারটি— ঋগ্বেদ, অথর্ব বেদ, সাম বেদ, যজুর্বেদ। বিশেষজ্ঞদের মতে বেদ রচিত হয়েছে তিন থেকে চার হাজার বছর পূর্বে। আর্য গোষ্ঠীদের পুরনো ভাষা সংস্কৃত। এ সংস্কৃতি ভাষায় বেদগুলো রচিত।

পুরাণ প্রথমে একটি ছিল। এখন আঠারোটি। এগুলোর মধ্য হতে পুরাণ ও উপপুরাণ সবচেয়ে বেশি প্রসিদ্ধ।

মহাভারত হচ্ছে ভারতবর্ষের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় উৎস। যা গদ্যধর্মী শৈলিতে রচিত। এই মহাভারতের বিষয়বস্তু হলো, কয়েকটি আর্য সম্প্রদায়ের পারস্পরিক যুদ্ধ। প্রাসঙ্গিকভাবে এতে অনেকগুলো গল্প-কাহিনীও উঠে এসেছে।

ভগবত গীতা মূলত মহাভারতেরই একটি অংশ। হিন্দুদের কাছে এটি খুবই সম্মানজনক ও গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। এতে সেই দীর্ঘ উপদেশগুলোর উল্লেখ রয়েছে, যা শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিল।

রামায়ণ হলো রামচন্দ্র নামের এক ব্যক্তির কর্মকাণ্ডের বিবরণ। হিন্দুদের দাবি অনুসারে এ লোক চার হাজার বছর পূর্বে পৃথিবীতে এসেছিল। রামায়ণ হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের ধর্মীয় গল্পকাহিনীর দর্পণ।

হিন্দুদের এই ধর্মগ্রন্থগুলোর বিশ্বাসযোগ্যতা কতটুকু— এ সম্পর্কে বিখ্যাত হিন্দু চিন্তাবিদ স্বামী দিয়ানন্দ লেখেন,

> 'এ গ্রন্থগুলো মহাঋষীদের নামে মনগড়া অসম্ভব গল্প-কাহিনী দিয়ে টইটুম্বর করে তৈরি করা হয়েছে। এগুলোর নাম 'পুরাণ' রেখে এখন চর্চাও করা হচ্ছে।'
>
> 'সব তন্ত্রগ্রন্থ, পুরাণ, উপপুরাণ, ভাষা, রামায়ণ, তুলসি দাস, কামিনী মঙ্গল ইত্যকার গ্রন্থগুলোসহ আরো যত ভাষাগ্রন্থ রয়েছে, এগুলো সব স্বহস্তে রচিত, বানোয়াট বই।'

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর অভিমত হলো—

> 'রামায়ণ ও মহাভারত হচ্ছে 'আলিফ-লায়লা' জাতীয় গল্পগ্রন্থ। এগুলোর কোনো বাস্তবতা নেই। [জাগো হিন্দু, জাগো]

৩. পুনর্জন্মে বিশ্বাস

হিন্দুদের মতে জীবন হলো অনন্ত। মানুষ যদি এক জন্মে পুণ্যার্জন করে তাহলে সে পরবর্তী জন্মে ভালো অবয়বে জন্ম নেবে। এটাই তার জন্যে স্বর্গ। আর যদি সে মন্দ কাজ করে তাহলে পরবর্তী জন্মে সে লাঞ্ছিত জন্তুর আকৃতিতে জন্ম নেবে। এটাই তার জন্যে নরক। এভাবে প্রতিটি সৃষ্টি সাতবার জন্ম নেয়।

প্রথা, উৎসব-পার্বন

হিন্দুধর্ম মূলত বিভিন্ন প্রথা ও উৎসবনির্ভর ধর্ম। ডজনখানেক উৎসব ও সহস্র প্রথার লতা-পাতায় জড়িয়ে এ ধর্মের বিধি-বিধান পালিত হয়। নিম্নে কয়েকটি নির্বাচিত উৎসব তুলে ধরা হলো—

দিওয়ালি... লক্ষ্মী পূজা

এটি হিন্দুদের সবচেয়ে বিখ্যাত উৎসব। দিওয়ালির রাতে সব হিন্দু প্রদীপ জ্বালিয়ে লক্ষ্মী দেবীর আগমনের প্রত্যাশা করে। ওই রাতে আতশবাজি করা হয়। প্রদীপ জ্বালানো হয়। গাভী সাজানো হয়। কেননা দক্ষিণ ভারতের হিন্দুরা গাভীকে লক্ষ্মী দেবীর অবতার মনে করে।

হোলি

এটি মূলত বসন্ত ঋতুর উৎসব। কিন্তু এখন এটাকে ধর্মীয় রঙে রাঙানো হয়েছে। এই উৎসবে একে অপরকে রঙ মেখে দেয়।

বসন্ত পূজা

এটিও বসন্ত মৌসূমের উৎসব। হিন্দুরা এই উৎসব মূলত এক রাসূলবিদ্বেষী লোকের কথা স্মরণ করে পালন করে থাকে, যাকে লাহোরের মুসলিম গভর্নর হত্যাদণ্ডে দণ্ডিত করেছিল।

সতিদাহ

হিন্দু বিধবাদেরকে তাদের স্বামীর চিতার সঙ্গে জ্বলে মরতে উদ্বুদ্ধ করা হয়ে থাকে। এটাকেই সতিদাহ বলে। যেসব নারী এভাবে জ্বলে-পুড়ে মরে তাদেরকে সতি দেবী বলা হয়। ভারতে সতিদাহ নিষিদ্ধ।

ভেঁট [বলি]

হিন্দু ধর্মানুসারে দুনিয়ার ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠুভাবে পালন করার জন্যে দেব-দেবীদের দৈহিক শক্তির প্রয়োজন পড়ে থাকে। বলিদানের মাধ্যমে তারা শক্তি ফিরে পান। পাশাপাশি এর মাধ্যমে তাদের সন্তুষ্টি পাওয়া যায়। মনের আকাঙ্ক্ষাও পূরণ হয়। জন্তু দিয়ে, কখনো কখনো মানুষকেও বলি দেওয়া হয়।

হিন্দুধর্মের ইতিহাস

হিন্দুধর্ম কম করে হলেও চার হাজার বছর পুরনো। এই ধর্মের মূল প্রবর্তক আর্য। খিষ্টপূর্ব দু' হাজার বছর আগে মধ্যএশিয়ার প্রান্তরগুলোতে যখন চতুষ্পদ জন্তুর খাদ্য-শষ্যের সংকট দেখা দেয় তখন তারা দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হন। আর্য গোত্রগুলো ইরান, আফগানিস্তান হয়ে ভারতবর্ষে প্রবেশ করে। ওই সময় এখানকার স্থানীয় গোত্র ছিল দ্রাবিড়। আর্য গোষ্ঠী দ্রাবিড়দের পরাজিত করে এখানে থিতু হয়। পরবর্তীকালে আর্য গোষ্ঠীর সঙ্গে দ্রাবিড়দের সম্প্রীতি গড়ে ওঠে। এই দু' গোষ্ঠীর মাঝে বিশ্বাস, প্রথা ও উৎসবের আদান-প্রদানের ফলে হিন্দুধর্ম গড়ে ওঠে।

জাত-পাত

হিন্দুধর্মে জাত-পাতের প্রবর্তক ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণরা এ কথা ছড়িয়ে দেয় যে, তারা ব্রহ্মার মুখ থেকে সৃষ্ট। ধর্মরক্ষার দায়িত্ব তাদের। তারা নিজেদেরকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি ও যেকোনো ধরনের জবাবদিহিতার ঊর্ধ্বে মনে করে। মুক্তি পেতে হলে তাদের অনুসরণ করা আবশ্যক। দেবতাদের ভেঁটের নামে তারা মন্দিরকে নিজেদের আয়ের স্বতন্ত্র উৎস বানিয়ে রেখেছে।

এর পাশাপাশি তারা রাজ্যশাসনের দায়িত্বের ঝঞ্ঝাট আর্য গোত্রগুলোর গোত্রপতির হাতে সোপর্দ করে দিয়েছে। এই শ্রেণিকে ক্ষত্রিয় বলা হয়। রাজনীতি ও সামরিক দায়-দায়িত্ব তাদের হাতে অর্পিত।

শষ্য উৎপাদন ও পার্থিব কায়কারবারের দায়িত্ব স্থানীয় অধিবাসীদের হাতে অর্পণ করা হয়েছে। এরা আগ থেকেই কৃষক, কারিগর, পেশাজীবি ও বণিক হিসেবে সম্পদ-বৈভবের অধিকারী ছিল। এদের নাম দেওয়া হয়েছে 'বৈশ্য'।

সেবার কাজগুলো অধীনস্থ গরিব গোত্রগুলোর হত-দরিদ্রদের কাছে অর্পণ করা হয়েছে। এদের নাম দেওয়া হয় শূদ্র। এরা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চাকর-ভৃত্য হয়ে সমাজে কোনোমতে টিকে থাকে। এদের ওপর কোনো নির্যাতন করা হলে এরা প্রতিবাদ করার ক্ষমতা রাখে না। এই শ্রেণিভেদ জন্মসূত্রে। অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ছেলে ব্রাহ্মণ হবে। ক্ষত্রিয়ের ছেলে ক্ষত্রিয় হবে। বৈশ্যের ছেলে বৈশ্য হবে। শূদ্রের সন্তান সবসময় শূদ্রই হবে।

মনুশাস্ত্র

মনু নামের এক ব্রাহ্মণ 'মনুশাস্ত্র' লিখে এই জাত-পাতের ব্যবস্থাপনাকে প্রাতিষ্ঠানিক মূলনীতির আকার দিয়েছিল। মনুশাস্ত্র ব্রাহ্মণের মতে,

> 'এই পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব ব্রাহ্মণের সম্পদ। কেননা সে সৃষ্টিতে বড়। সকল বস্তু তারই।' [প্রথম অধ্যায়]
>
> ব্রাহ্মণ প্রয়োজন বোধ করলে নিরপরাধ শূদ্রের সম্পদও বলপূর্বক কেড়ে নিতে পারবে। এই জবরদখলের কারণে সে

> অপরাধী সাব্যস্ত হবে না। কেননা শূদ্রের সমস্ত সম্পদ তারই মালিকানাধীন।' [অষ্টম অধ্যায়]
>
> 'যে অপরাধের কারণে অন্য বর্ণের লোকদের মৃত্যুদণ্ড হয়, একই অপরাধ ব্রাহ্মণ করলে তার শুধু মাথা ন্যাড়া করিয়ে দেওয়া হবে।'

হিন্দুদের ধর্মীয় প্রতীক

তিলক : সাদা রঙ দিয়ে মাথায় অঙ্কিত প্রতীক। আরেকটি হলো, লাল রঙ দিয়ে মাথায় অঙ্কিত প্রতীক। এগুলো ভগবানের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্কের প্রতীক বহন করে। হিন্দুধর্মের নারীদের মাথায়ও লাল রংঙের রেখা আঁকার প্রচলন রয়েছে। যা তাদের বিয়ের প্রতীক মনে করা হয়।

হিন্দুধর্মের চৈন্তিক প্রভাব

হিন্দুইজম যদিও অভ্যন্তরীণভাবে অত্যন্ত দুর্বল ও মূর্খ আচরণসর্বস্ব; কিন্তু এরপরও এই ধর্মটি ভারতবর্ষের অল্পশিক্ষিত মুসলিমদের প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়েছে। বিয়ে, শোক, মেলা, উৎসব এবং পোশাক-পরিচ্ছদের ক্ষেত্রে এ অঞ্চলের মুসলিমরা তাদের প্রভাবের শিকার। সংস্কৃতির পাশাপাশি হিন্দুইজম মুসলিমদের বিশ্বাসের নাভীমূলে প্রভাব ফেলছে। কবরপূজা, গায়রুল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা, উরস পালন করাসহ অনেকগুলো বড় বড় হিন্দুয়ানি প্রথা ও কুসংস্কৃতিতে এদেশের মুসলিম সম্প্রদায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে।

হিন্দু মিডিয়ার আক্রমণ

উপরিউক্ত প্রভাবগুলো হলো ওই সময়ের, যখন হিন্দুরা চৈন্তিক আক্রমণ করার কোনো পরিকল্পনা করেনি। কিন্তু বর্তমান যুগে তারা মিডিয়ার সৈন্য-সামন্ত সঙ্গে নিয়ে মুসলিমদের সংস্কৃতি, চিন্তাধারা ও আদর্শের ওপর একের পর এক আক্রমণ করে যাচ্ছে। তাদের সেই আক্রমণে শুধু পাক-ভারতের মুসলিমরাই নয়; আরব-ইউরোপের মুসলিমরাও প্রভাবিত হচ্ছে। ভারতীয় মিডিয়া, বলিউডের ফিল্ম আর টিভি চ্যানেলগুলো

আমাদের দেশে অহরহ প্রদর্শিত হচ্ছে। সেখানে প্রকাশ্যে ইসলামি মূল্যবোধে কুঠারাঘাত হানা হচ্ছে। অজান্তে-অবচেতন মনে মানুষ ইসলামি বিশ্বাস ও সংস্কৃতি থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।

ধর্মান্তর ফিতনা

মিডিয়ার বহুমুখী আক্রমণের পাশাপাশি উগ্র হিন্দু সংগঠনগুলো ভারতীয় মুসলিমদের অজ্ঞতার সুযোগের সদ্ব্যবহার করে তাদেরকে হিন্দুধর্ম গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করছে। এই অভিযানের তারা নাম দিয়েছে 'শুদ্ধি অভিযান'। এই সংগঠনের সদস্যরা মুসলিমদের বোঝাচ্ছে যে, তোমরা আগে হিন্দু ছিলে। মুসলমান সম্রাটরা তোমাদের পিতৃপুরুষদের জোরপূর্বক মুসলিম বানিয়েছিল। কিন্তু এখন তো তোমরা স্বাধীন। তারপরও যদি তোমরা মুসলিম থাকো তাহলে তোমাদেরকে কোনো ধরনের সহায়তা করা হবে না। তোমাদের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা থাকবে না। তোমাদেরকে কোথাও চাকরি বা জীবিকা উপার্জনের সুযোগ দেওয়া হবে না। এমনকি শিক্ষা-দীক্ষার সুযোগও তোমাদের জন্যে থাকবে না। এভাবে তারা ছলে-বলে-কৌশলে মুসলিমদেরকে হিন্দু বানাচ্ছে।...

বৌদ্ধধর্ম

বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক গৌতম বুদ্ধের আসল নাম সিদ্ধার্থ। তিনি ছিলেন খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর মানুষ। ছিলেন কপিলার রাজপুত্র ও সিংহাসনের ভবিষ্যত উত্তরাধিকারী। দীর্ঘ দিন তপস্যা, সাধনা, অধ্যবসায় ও চিন্তা–ভাবনার মাধ্যমে তিনি মুক্তির পথ অন্বেষণ করেন। এভাবে একসময় একটি নতুন ধর্ম উপস্থাপন করতে সক্ষম হন। গৌতম বুদ্ধের বার্তা ছিল, পার্থিব জীবন আসলে কিছুই নয়। কাজেই এর সঙ্গে মনের বাঁধন তৈরি করা যাবে না। বুদ্ধের শিক্ষার মাঝে ঈশ্বরের উল্লেখ নেই। এমনকি তিনি নিজেও কোনোদিন প্রভুত্বের দাবি তোলেননি। তিনি নিজেকে শুধু একজন আধ্যাত্মিক গুরু হিসেবে উপস্থাপন করেছেন।

ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের সোনালি যুগ ছিল অষ্টম-নবম শতাব্দী পর্যন্ত। এরপর ধীরে ধীরে হিন্দু ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্ম নিজস্ব মৌলিক মতবিরোধ সত্ত্বেও একে অপরের কাছাকাছি আসতে থাকে। একপর্যায়ে ভারতবর্ষ থেকে বৌদ্ধমত বিদায় নেয়।

বৌদ্ধধর্মমতের দুটি বৃহৎ গোষ্ঠী রয়েছে। হিনযান ও মহাযান।

হিনযান (Hinayana) গোষ্ঠী

এই গোষ্ঠী বৌদ্ধমতের নৈতিক মূলনীতিগুলোকে একটি আনুষ্ঠানিক ধর্মের রূপ দেওয়ার চেষ্টা করে। তারা এখানে ঈশ্বরের ধারণা এভাবে সংযুক্ত করে যে, তোমরা গৌতম বুদ্ধকে ঈশ্বরের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করো। এর পাশাপাশি তারা হিন্দুদেরকে আকৃষ্ট করার জন্যে তাদের অনেক দেব-দেবীকে তাদের ধর্মে স্থান দেয়। তবে সর্বোচ্চ স্থানটি রেখে দেয় গৌতম বুদ্ধের জন্যে। এ মতবাদটি শ্রীলঙ্কা ও বার্মায় প্রচুর প্রসার লাভ করে; কিন্তু নিজ জন্মভূমি ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণদের প্রভাব গ্রহণ করতে করতে একসময় পুরোপুরি নিঃশেষ হয়ে যায়।

মহাযান বৌদ্ধমত

এই ধর্মমতের অনুসারীরা চিন, জাপান, তিব্বত, মঙ্গোলিয়া, জাভা ও সুমাত্রা দ্বীপপুঞ্জে বসবাস করে। এই মতবাদের অনুসারীরা একজন সত্তাকে প্রভুত্বের আসনে আসীন করে। আর গৌতম বুদ্ধকে তার সাময়িক প্রকাশস্থল অভিহিত করে তাকে ঈশ্বর বিশ্বাস করে। সাধারণ মানুষদের জন্যে নৈতিক অনুশাসন মেনে চলাকেই যথেষ্ট মনে করে। এই গোষ্ঠীর অনুসারীরা ভাস্কর্য ও মূর্তির শিল্প ছড়িয়ে দিয়েছে।

ইহুদিজম

ক্যামব্রিজ অভিধান অনুসারে—

> 'ইহুদিয়ত হচ্ছে ইহুদিদের ধর্ম। তারা এক প্রভু এবং তাওরাত ও তালমুদে বিবৃত বিধানের ওপর বিশ্বাস লালন করে।'

'ইহুদ' এর সংজ্ঞা হলো,

> 'ইহুদ এমন জাতি, যারা নিজেদের হযরত মুসা আলাইহিস সালামের উম্মত দাবি করে'।

ইহুদিদের মৌলিক নীতি ও বিশ্বাস হলো—

> 'ইহুদি হয় মা-বাবার ঘরে জন্ম নিয়ে, এক প্রভুর ওপর বিশ্বাস, তাওরাতের ওপর বিশ্বাস, অঙ্গীকার দিবসের ওপর বিশ্বাস অর্থাৎ ওই অঙ্গীকারের ওপর যা প্রভু ইবরাহিমকে দিয়েছিলেন, যেখানে তাদেরকে ভূমণ্ডলের ওপর প্রতিনিধিত্ব ও রাজত্ব দেওয়ার অঙ্গীকার রয়েছে।'

এ ধর্মের বুনিয়াদি উপাসনা ও কর্মকাণ্ড হলো—

> 'হালাল যবেহকৃত বস্তু ভক্ষণ, জন্মের অষ্টম দিনে খতনা করানো, আয়ের এক দশমাংশ উপসনালয় বা ধর্মের জন্যে উৎসর্গ করা, বিশেষ দিবস ও উৎসব পালন করা, যেমন, ফাসহ উৎসব ও ইয়াওমুস সাবত। এর পাশাপাশি মহাপ্রলয়ের পূর্বে দাউদ আলাইহিস সালামের বংশধরদের মধ্য হতে একজন বিশ্বজয়ী সম্রাট (দাজ্জাল) এর আত্মপ্রকাশ এবং সমগ্র পৃথিবীর ওপর ইহুদিদের একচ্ছত্র আধিপত্যের ধারণাও ইহুদিদের মৌলিক বিশ্বাসের উল্লেখযোগ্য অংশ।

ইহুদি জাতির ইতিহাস

ইহুদি জাতির ইতিহাসের সূচনা হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের যুগ থেকে। যাঁর আসল নাম, ইসরাঈল (আবদুল্লাহ)। তাঁর বারো সন্তানের বংশধর মিসরে প্রতিপালিত হয়। তাদের থেকেই বনি ইসরাঈলের বারোটি গোত্রের সূত্রপাত। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ফেরাউনের কবল থেকে মুক্ত করতে হযরত মুসা আলাইহিস সালামকে প্রেরণ করেন। ফেরাউন তাদের পশ্চাদ্ধাবন করার শেষ পর্যায়ে সমুদ্রে ডুবে মারা যায়। ফেরাউনের কবল থেকে নিষ্কৃতি পেতেই বনি ইসরাইল শুরু করে দেয় হযরত মুসা আলাইহিস সালামের অবাধ্যাচরণ। বারবার সতর্ক করার পরও এ জাতিটি নিজেদের শোধরায়নি। মুসা আলাইহিস সালামের যুগে বনি ইসরাইল নিজ মাতৃভূমি ফিলিস্তিনে ফিরে আসতে পারেনি।

হযরত মুসা পরবর্তী যুগ

কুযাত যুগ : বনি ইসরাইলের পরবর্তী প্রজন্ম ইউশা' বিন নুন আলাইহিস সালামের নেতৃত্বে জিহাদ করে ফিলিস্তিন পুনর্দখল করতে সমর্থ হয়। তাদের প্রথম স্বাধীন সাম্রাজ্যের এই যুগটিকে 'কুযাত যুগ' বলা হয়। যা প্রায় ৪০০ বছর টিকে থাকে।

মুলুক যুগ : এরপর সম্রাটদের স্বাধীন ক্ষমতার যুগ চলে আসে। দাউদ আলাইহিস সালাম ও সুলাইমান আলাইহিস সালামের যুগে নবুওয়াত ও রাজত্ব এক মোহনায় চলে আসে। ওই সময়কালটি ছিল ইহুদিদের সোনালি যুগ। ওই সময় তারা উত্থানের সর্বোচ্চ শিখরে ছিল। কিন্তু সুলাইমান আলাইহিস সালামের ইনতিকালের পর তাদের মাঝে নিম্নপ্রবৃত্তির কর্মকাণ্ড ও সবধরনের মন্দকাজ ব্যাপকাকারে ছড়িয়ে পড়ে।

ইনকিসাম (বিভাজনের) যুগ : বিশ্বাসের অধপতন ও নিকৃষ্ট কর্মকাণ্ডের কারণে বনি ইসরাইলের মাঝে বড় ধরনের ভাঙন দেখা দেয়। এক পর্যায়ে তারা দুটি পৃথক রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে পড়ে। যারা বাইতুল মাকদিসকে কেবলা জ্ঞান করত, তারা 'ইয়াহুযা' নামের একটি ভিন্ন সাম্রাজ্য গড়ে তোলে। এ রাষ্ট্রের রাজধানী ছিল 'আল-কুদস'। আর যারা আল-কুদসকে কেবলা মনে করত না, তারা দক্ষিণাঞ্চলে 'ইসরাইল

(গালিল) সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। এই দু রাজ্যের অধিবাসীদের মাঝে তীব্র শত্রুতা ছিল। এ যুগটিকে বিভাজনের যুগ বলা হয়।

বাবেলের বশ্যতা : মাসিহপূর্ব ৫৮৬ সালে ইরাকের সম্রাট বুখতে নসর তাদের উপাসনালয় ধ্বংস করে। অসংখ্য ইহুদিকে হত্যা করে। প্রায় ৭০ হাজার ইহুদিকে বন্দি বানিয়ে ইরাকের 'বাবেল' শহরে নিয়ে যায়।

নিষ্কৃতির যুগ : খ্রিস্টপূর্ব ৫৩৮ সালে শুরু হয় তাদের নিষ্কৃতির যুগ। পারস্যসম্রাট সাইরাস (Cyrus) ইরাক ও শামদেশ দখল করে। সে ইরাকে বসবাসরত বনি ইসরাইলিদের বাইতুল মাকদিসে ফিরে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করে।

গ্রিক ও রোমানদের অধীনতা : খ্রিস্টপূর্ব ৩৩২ সালে গ্রিকবীর আলেকজান্ডার এশিয়ার ওপর আক্রমণ করে। যার ফলশ্রুতিতে দুশ বছরেরও অধিক কাল বনি ইসরাইল গ্রিকদের কাছে পরাধীন থাকে। খ্রিস্টপূর্ব ৬৪ সালে রোমশাসক পোম্পাই গ্রিকদের পরাজিত করে ফিলিস্তিন দখল করে। যার ফলে বনি ইসরাইল এক জাতির পরাধীনতা থেকে বেরিয়ে অন্য জাতির দাসত্বে চলে যায়। ওই যুগে ইহুদি ধর্মবেত্তারা পার্থিব স্বার্থের জন্যে তাওরাতের মনগড়া ব্যাখ্যা করে বেড়াতো। ব্যাখ্যার এই ভিন্নতার কারণে তাদের মাঝে একটার পর একটা ফেরকা জন্মাতে থাকে।

তাদের সংশোধনের জন্যে কোনো নবি-রাসূল এলে তারা সর্বশক্তি ব্যয় করে প্রত্যাখ্যান করত। এভাবে তারা অজস্র নবিকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করে শহিদ করেছে। অবলীলায় তারা হযরত যাকারিয়া আলাইহিস সালাম ও হযরত ইয়াহইয়া আলাইহিস সালামের মত সম্মানিত নবিদের অত্যুচ্চ পদমর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের ন্যুনতম তোয়াক্কাও করেনি। অবশেষে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম আগমন করেন। যখন তিনি তাদের সামনে ইঞ্জিল কিতাব পেশ করেন, যেই ইঞ্জিলের মাঝে হযরত মুসা আলাইহিস সালাম প্রবর্তিত শরিয়তের সঙ্গে বৈপরীত্ব রয়েছে, এমন বিধানও ছিল, তখন বনি ইসরাইল তাঁর প্রাণঘাতী শত্রুতে পরিণত হয়। তাঁকে শহিদ করার চক্রান্তে মেতে ওঠে। যার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে আকাশে উঠিয়ে নেন। যে

লোকটি ইহুদিদের পক্ষে গোয়েন্দাবৃত্তি করছিল, তাকে আল্লাহ তাআলা অবিকল ঈসা আলাইহিস সালামের অবয়ব দান করেন। ইহুদিরা কৌশলের কাছে পরাজিত হয়ে সে লোকটিকেই পাকড়াও করে শূলিতে ঝুলিয়ে দেয়।

লাঞ্ছনা ও অবমাননার যুগ : ঈসা আলাইহিস সালামকে আসমানে তুলে নেওয়ার পর ইহুদিদের অবাধ্যতা তীব্র আকার ধারণ করে। তারা তাদের হারানো সাম্রাজ্য ফিরে পাওয়ার খোয়াব দেখতে শুরু করে। যদিও এর জন্যে তাদের সর্বাগ্রে প্রয়োজন ছিল নিজেদের সংশোধন করা; কিন্তু তা না করে তারা পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে গোপনে গোপনে নানা রকমের চক্রান্ত ও অপতৎপরতা শুরু করে দেয়। তাদের একের পর এক বিশৃঙ্খলাপ্রবণ আচরণে বিরক্ত হয়ে রোমসম্রাট টুয়েসটি (Tysty) ৭০ ঈসাব্দে ইহুদিদের রক্ত নিয়ে হোলি খেলায় মেতে ওঠে। বাইতুল মাকদিসে হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম কর্তৃক নির্মিত বনি ইসরাইলের উপসনালয় ধ্বংস করে।

১৩৫ খ্রিস্টাব্দে আরেক রোমসম্রাট আড্রিয়ান ইহুদিদেরকে বাইতুল মাকদিস থেকে বের করে দেয়। সেখানে তাদের অনুপ্রবেশের ওপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে।

ইসলামের সূচনাকাল হতে আজোব্দি : নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগেও ইহুদিদের মাঝে এমন কিছু ধর্মগুরু বিদ্যমান ছিল, যারা উদ্ধারকারী শেষ নবি সম্পর্কে তাওরাতগ্রন্থে আলোচিত নিদর্শনাবলি সম্পর্কে সম্যক অবগত ছিল। একের পর এক বিকৃতি সত্ত্বেও তাওরাত ও ইঞ্জিল— উভয় ধর্মগ্রন্থে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনেকগুলো আলামত বিধৃত ছিল। শৈশবে নবিজি যখন শামদেশ সফর করেন তখন সেখানকার বেশ কিছু খ্রিস্টান পাদরি তাঁকে চিনতে পেরেছিল। হিজরতের পর মদিনার ইহুদিরাও বিশেষ আলামতগুলোর কল্যাণে নবিজিকে চিনতে পেরেছিল।

নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলিমদেরকে ইহুদিদের ফিতনা সম্পর্কে মুক্ত রাখতে তাদেরকে শুধু মদিনা থেকেই বের করেননি; বরং জীবনের অন্তিম দিনগুলোতেও তিনি ইহুদি-নাসারাদেরকে পুরো আরব বদ্বীপ থেকে বের করার অসিয়ত করেছিলেন।

ইহুদিরা মুসলিমদের বিরুদ্ধে তাদের কার্যক্রম শুরু করে এভাবে যে, প্রথম দিকে তারা মুসলিমদের মাঝে বিভিন্ন নতুন নতুন ফেরকা জন্ম দেওয়ার চেষ্টা করত। যার পরিণতিতে সর্বপ্রথম শিয়া সম্প্রদায় আত্মপ্রকাশ করে। এই ষড়যন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা আবদুল্লাহ ইবনে সাবা ছিল ইহুদি বংশোদ্ভূত। বর্তমান পৃথিবীতেও যতগুলো গুমরাহ ফেরকাহ রয়েছে, এদের সবগুলোকে ইহুদিরা গোপনে পৃষ্ঠপোষকতা ও সার্বিক সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান করে থাকে।

পরবর্তী শতাব্দীগুলোতে ইহুদিদের তৈরিকৃত গোপন সংগঠন ও এজেন্সিগুলো প্রয়োজনীয় শক্তি-সামর্থ্য অর্জন করে ইউরোপের অর্থনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক উৎসগুলো দখল করতে সমর্থ হয়। তারা খ্রিস্টানদের মন থেকে তাদের প্রতি ঘৃণাত্মক মনোভাব কমাতে সক্ষম হয়। তারা তাদের কাছে নিজেদের অসহায়ত্ব ও দুরবস্থা তুলে ধরতে তাদের সহমর্মিতা বাগিয়ে নেয়। বিভিন্ন ইউরোপিয়ান রাষ্ট্র ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতে তারা নিজেদের লোকজনকে অধিষ্ঠিত করে। এদের সহযোগিতায় ১৯৪৮ সালে ফিলিস্তিনে তারা নিজেদের স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়।

বর্তমান সময়ের ইহুদিদের বংশধারা

ইহুদিরা নিজেদের পরিচয় দেয়, তারা বনি ইসরাইলের বিভিন্ন নবির সন্তান; কিন্তু বাস্তবতা হলো, বর্তমান যুগের সংখ্যাগরিষ্ট ইহুদি খালেস ইয়াকুব আলাইহিস সালামের বংশধর আদৌ নয়। তাদের মাঝে অনেকগুলো গোষ্ঠীর রক্ত মিশে গেছে। হ্যাঁ, কিছু বৈশিষ্ট্য যেমন, লোভ, হিংসা, অহঙ্কার, সুদখোরি ইত্যকার বৈশিষ্ট্য এদের সবার মাঝে পাওয়া যায় বটে; কিন্তু এগুলোকে বংশীয় বৈশিষ্ট্য না বলে জাতিগত বৈশিষ্ট্য বলাই বাস্তবতাশ্রিত হবে।

ইহুদি ধর্মের উৎস

ইহুদিরা নিজেদের ধর্ম লুকিয়ে রাখতে পসন্দ করে। কেননা তাদের ধর্মীয় ও বংশীয় আত্মম্ভরিতা তাদেরকে বাকি পৃথিবীকে ঘৃণা করতে শেখায়।

তারা পৃথিবীর সবগুলো জাতি ও সম্প্রদায়কে নিজেদের প্রতিপক্ষ মনে করে। তাদের ধর্মের উৎসগ্রন্থ তিনটি—

১. বিকৃত তাওরাত ২. তালমুদ (Talmud) ৩. কাব্বালা (Cabbala) ।

১. বিকৃত তাওরাত

ইহুদিদের মতে তাওরাত হলো সেই পাঁচটি আসমানি পুস্তিকার সমন্বিত রূপ, যা মুসা আলাইহিস সালাম নিজের হাতে লিখেছিলেন। কিন্তু হযরত মুসা আলাইহিস সালামের আসল তাওরাতের স্থলে এখন তাদের কাছে বিকৃত তাওরাত রয়েছে। এই গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে এমন এমন বিশ্বাসের কথা লেখা রয়েছে, যা আল্লাহ ও রাসূলদের পদমর্যাদার সুস্পষ্ট অবমূল্যায়ন করে।

ইহুদিদের ধর্মে প্রভুকে 'ইয়াহুওয়াহ' বলা হয়। তারা যদিও এক প্রভুর প্রবক্তা; কিন্তু তার ব্যাপক ক্ষমতা ও সম্মান-মর্যাদা এবং শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে তারা কিছুই জানে না। বিকৃত তাওরাতের বক্তব্য অনুসারে, আল্লাহ তাআলা হলেন পৃথিবীর অন্য সব সম্রাটের মতো। যিনি মাঝে মাঝে ভুলে যান। উদাসীন হন। এমনকি ভুল সিদ্ধান্তও নেন। প্রভু নিজেও মাঝে মাঝে অশ্রু ঝরান। উদ্বিগ্ন হন। অনেক কিছু তার কাছেও অজ্ঞাত থাকে। মাঝে মাঝে তিনি নিজ সিদ্ধান্তের ওপর অনুতপ্তও হন। [খুরুজ- ৩২ : ১৪] তিনি মাঝে মাঝে ক্লান্তও হন। [তাকবিন- ২ : ২] ইহুদিদের মতে প্রভুর শরীর রয়েছে। [খুরুজ- ১৩ : ২১]

তারা এ কথাও বলে যে, আমাদের পূর্বসূরিগণ মুসা আলাইহিস সালামের সঙ্গে গিয়ে প্রভুকে দেখেছেন। [খুরুজ- ২৪ : ৯]

তাওরাতে বিভিন্ন নবি সম্পর্কে বিশ্বাস

হযরত নুহ আলাইহিস সালাম মদপান করেছেন। [তাকবিন- ৯ : ২০] হযরত লুত আলাইহিস সালামের মেয়েরা তার সঙ্গে অপকর্ম করেছে। [তাকবিন- ১৯] হযরত হারুন আলাইহিস সালাম বাছুরপূজার নির্দেশ দিয়েছিলেন। [খুরুজ ১ থেকে ২০-৩২ পর্যন্ত] হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম বিলাসী ছিলেন। তার বিলাসপ্রবণতার কারণেই সাম্রাজ্যের পতন ঘটেছিল। [আখবার- ৯,২৩,২৮] নাউযুবিল্লাহ

নবিদের সম্পর্কে ইহুদিদের এ ধরনের ঔদ্ধত্বের কারণ হলো, তারা কখনই মহান নবিদেরকে অন্তর থেকে সম্মান করত না। তারা মনে করতেন, নবিরা অত্যাচারী শাসকদের সমগোত্রীয় ছিলেন।

পরকাল সম্পর্কে বিশ্বাস

'আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস' এটা সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরামের শিক্ষার মাঝে মৌলিক বুনিয়াদ হিসেবেই বিদ্যমান ছিল। বিস্ময়ের বিষয় হলো, তাওরাতের মাঝে পরকালের উল্লেখ নেই। সেখানে যতগুলো সুসংবাদ রয়েছে, সেগুলোর সবকটিই পার্থিব সাফল্য, উন্নতি, উত্থান ও রাষ্ট্রক্ষমতা সম্পর্কিত। সম্ভবত অন্যান্য বিকৃতির মত ইহুদি ধর্মবেত্তারা পরকাল সম্পর্কিত সব আলোচনা তাওরাত থেকে বেমালুম গায়েব করে দিয়েছে। উদ্দেশ্য হলো, এর মাধ্যমে ইহুদিদের পূর্ণ মনোযোগ পার্থিব উন্নতি-অগ্রগতির ওপর নিবদ্ধ রাখা যাবে এবং তারা দ্রুততার সঙ্গে অগ্রসর হয়ে দুনিয়াবি সাফল্যের শীর্ষচূড়ায় আরোহণ করতে সক্ষম হবে।

এভাবে বিকৃতি করে তাওরাত গ্রন্থকে পরকাল সম্পর্কিত আলোচনা থেকে কপর্দকশূন্য করে ফেলার পরিণতি গিয়ে দাঁড়ায় যে, ইহুদিরা এখন মৃত্যু ও পরকালের আলোচনাকে মারাত্মক ভয় পায়। এ কারণেই কুরআন কারিম মৃত্যুভীতিকে ইহুদিদের অন্যতম মারাত্মক ব্যাধি সাব্যস্ত করেছে।

২. তালমুদ (Talmud)

তালমুদের পারিভাষিক সংজ্ঞা হলো—

> 'ইহুদিদের ধর্মসংক্রান্ত বর্ণনাসমূহ ও শিষ্টাচার সম্পর্কিত শিক্ষা, যা এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে মৌখিকভাবে বর্ণনান্তরিত হয়ে এসেছে।'

ইহুদিরা দাবি করে, তালমুদ হলো এমন কিছু বর্ণনার সামষ্টিক সংকলন, যা তাওরাত থেকে অতিরিক্ত। যা হযরত মুসা আলাইহিস সালাম থেকে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে মৌখিকভাবে বর্ণিত হয়ে হয়ে তাদের পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে। এই বর্ণনাগুলোর মর্যাদা তাওরাত থেকেও উঁচু। সেখানে যা

রয়েছে, তা খোদাওয়ান্দ 'ইয়াহওয়াহ' এর প্রণিধানযোগ্য নির্দেশ। যা সর্বাগ্রে বাস্তবায়ন করতে হবে।

বাস্তবতা হলো, তালমুদ হচ্ছে তাওরাতের বিধি-নিষেধ থেকে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখার একটি কৌশলগত চেষ্টা। কারণ হলো, বিকৃত তাওরাতগ্রন্থে সার্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে যতই উচ্চ মানসম্পন্ন ও শ্রেষ্ঠ নির্দেশনা থাকুক না কেন, সেখানে যেহেতু ইহুদিদের বংশীয় গৌরব ও পৃথিবীর অন্যান্য জাতি-গোষ্ঠীদেরকে ঘৃণাত্মক, তাচ্ছিল্যকর ও হেয় চোখে দেখার মত উপাদান নেই; অথচ এগুলোই ইহুদিদের মজ্জাগত অভিলিপ্সা, এজন্যে ইহুদি ধর্মগুরুরা তালমুদ বানিয়ে নিয়েছে। প্রথম দিকে ঈসায়ি দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত অল্প অল্প করে 'তাওরাতের' ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'মিশনা' লেখা হয়। পরবর্তীকালে মিশনার বিভিন্ন ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচিত হয়। ব্যাখ্যাগ্রন্থসমগ্রকে 'জিমারাহ' নাম দেওয়া হয়। পরবর্তীকালে সুবিধার জন্যে 'মিশনা' ও 'জিমারাহ'-কে এক মলাটে সংকলন করা হয়। এই সংকলনগ্রন্থকেই 'তালমুদ' নাম দেওয়া হয়েছে। তালমুদের এই সংস্করণগুলোর প্রতিটি পৃষ্ঠার উপরে 'মিশনা' এর মূল ট্যাক্সট রয়েছে। এরপর বিভাজন রেখা এঁকে নিজে 'জিমারাহ' এর বাক্যগুলো যুক্ত রয়েছে।

তালমুদের কিছু আলোচ্য বিষয়

* আল্লাহ দিনের ১২ ঘণ্টা কাজ করেন। তন্মধ্য হতে ৩ ঘণ্টা শরিয়ত পড়েন। ৩ ঘণ্টা বিধি-বিধান প্রয়োগে ব্যয় করেন। ৩ ঘণ্টা পৃথিবীর রিজিক-জীবিকার কাজে ব্যয় করেন। অবশিষ্ট ৩ ঘণ্টা মৎস্যরাজার সঙ্গে খেলাধুলা করেন।
* কিছু শয়তান ও জ্বিন আদম ও হাওয়ার সন্তান। কেননা এদের দু'দলই পুরুষ ও নারী শয়তানদের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত হয়ে থাকে। নাউযুবিল্লাহ।

ভিন্ন সম্প্রদায় সম্পর্কে বিশ্বাস

* ইহুদিদের প্রহার করা আল্লাহর সম্মানের ওপর আক্রমণ করার নামান্তর।

* ইহুদিরা অপরাপর জাতি-গোষ্ঠীর জীবন ও সম্পদের মালিক।
* সমস্ত মানব জাতিকে সৃষ্টি করা হয়েছে ইহুদিদের সেবা করার জন্যে।
* জান্নাত শুধু ইহুদিদের জন্যে বরাদ্দকৃত।
* অ-ইহুদিদের আত্মা শয়তানি আত্মা।

বিশ্বজয় সম্পর্কে বিশ্বাস

* যখন উদ্ধারকর্তা আসবে তখন সমস্ত অ-ইহুদি অনিষ্টকামীদের রাজত্বের অবসান ঘটবে।
* ইহুদিদের আবশ্যক দায়িত্ব হলো, অন্য সমস্ত জাতি-গোষ্ঠীর রাজত্বের অবসান ঘটানো।
* ইহুদিদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে একটি মহাযুদ্ধ (Armageddon) সংগঠিত হবে। ওই যুদ্ধে পৃথিবীর দু-তৃতীয়াংশ ধ্বংস হয়ে যাবে।

খ্রিস্টানদের সম্পর্কে বিশ্বাস

ইহুদিরা তাদের পৃষ্ঠপোষক খ্রিস্টানদের সম্পর্কে কি ধরনের বিশ্বাস লালন করবে, তার আলোচনা তালমুদে এভাবে এসেছে,

* ঈসা মসিহ ছিলেন ইহুদ ধর্মের মুরতাদ (ধর্মত্যাগী), কাফের ও হত্যাদণ্ডে দণ্ডিত। বর্তমানে তিনি জাহান্নামে ভয়ানক শাস্তি ভোগ করছেন।
* ঈসার জননী 'বান্দার' নামের এক সিপাহির সঙ্গে অবৈধ যৌনকর্মে লিপ্ত হয়েছিল। সেই সূত্রেই ঈসা জন্ম গ্রহণ করেন।
* খ্রিস্টানদের গির্জা পঙ্কিলতার স্তূপ। নর্দমার মতো। সেখানে যেসব পাদরি বক্তৃতা দেয়, তারা কুকুরের মতো। ঘেউ ঘেউ করে বেড়ায়।

তালমুদের বর্তমান অ-হিব্রু সংস্করণগুলো থেকে উপরিউক্ত কথাগুলো কেটে রাখা হয়েছে। তালমুদের হিব্রু সংস্করণে কথাগুলো এখনো আছে। যার মূলকপি ইহুদি ধর্মবেত্তাদের কাছে কঠোর নিরাপত্তার সঙ্গে লুকায়িত আছে। অন্য কোথাও পাওয়া যায় না।

৩. কাব্বালা (Cabbala)

ইহুদি ধর্মের তৃতীয় মৌলিক স্তম্ভ হলো, কাব্বালা। এর মাঝে যাদু-টোনা, অন্যকে মোহাচ্ছন্ন ও যাদুগ্রস্ত করে ফেলার দর্শন ও বিভিন্ন পদ্ধতি আলোচিত হয়েছে। যাদু হলো, কুফরি-শিরকি কথা ও কর্মকাণ্ডের ওপর নির্মিত একটি অপবিত্র কর্মকৌশল। যাদু আল্লাহ তাআলার কাছে চরম অপ্রিয়। এর বিপরীতে যাদু শয়তানের কাছে অতিপ্রিয়। যেহেতু আল্লাহ তাআলা শয়তানকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে একটি সীমিত শক্তি দিয়েছেন, এজন্যে শয়তান তার ওই শক্তি যাদুগিরির কাজে ব্যয় করে থাকে।

হাজার বছর পূর্বে যখন দুর্ভাগা ইহুদিরা দেখতে পায় যে, তারা নিজেদের অপকর্মের কারণে আল্লাহর ক্রোধের পাত্রে পরিণত হয়েছে তখন তাদের দায়িত্ব ছিল, তাওবা করে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার কাজে নিজেদের নিয়োজিত করা; কিন্তু তারা তা না করে উল্টো শয়তানের কাছে সহায়তার হাত পাততে শুরু করে। শয়তানের শিখিয়ে দেওয়া মন্ত্রের সাহায্যে তারা নানাবিধ শয়তানি কর্মকাণ্ড শুরু করে দেয়। এভাবেই তাদের যাদুর প্রভাব সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। ধীরে ধীরে এটি সংকলিত শাস্ত্রের রূপ পেয়ে যায়। এভাবে যাদুগিরি শাস্ত্র 'কাব্বালা' এর নাম ও ধরণ গ্রহণ করে।

এই শয়তানি কর্মকাণ্ডের মাঝে খুনপ্রথা খুবই গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। ধীরে ধীরে ইহুদি যাদুকরদের খুনি প্রথাগুলো ইহুদিধর্মের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়। এ ধরনের একটি প্রথা হলো, 'ফাসাহ উৎসব'। এই উৎসবের সময় ইহুদিরা একটি বিশেষ ধরনের যাদুয়ানা রুটি তৈরি করে ভক্ষণ করে। ওই রুটির আটার খামিরার মাঝে দশ বছরের কম বয়সী অ-ইহুদি শিশুর রক্ত নিংড়ে দেওয়া হয়। 'পুরিম' উৎসবে শিশুর পরিবর্তে যুবক ছেলের রক্ত দিতে হয়। যেই শিশু বা যুবককে বলি দেওয়া হয়, তাকে জীবিত শরীরে একটি টাংকির ভেতর ফেলা হয়। পূর্ব থেকেই ওই টাংকির ভেতর সূঁইয়ের মত ধারালো শলাকা পাতা থাকে। টাংকির ভেতর থেকে নালা বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত বেরিয়ে এসে আটার ওপর পড়তে থাকে।

কাব্বালাচর্চার উদ্দেশ্য

ইহুদিরা তাদের বড় বড় স্বার্থ ও উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার কাজে এই কাব্বালা শাস্ত্র ব্যবহার করে থাকে। যেমন,

১. প্রতিপক্ষের কাউকে মানসিকভাবে বশীভূত করা, তাদেরকে মানসিক ও শারীরিকভাবে বিকলাঙ্গ করা, বা হত্যা করা।

২. আত্মপ্রশান্তি ও শয়তানের নৈকট্য অর্জন করা। যেন, তাদের সার্বিক কর্মকাণ্ডে শয়তানের অপবিত্র সহযোগিতা থাকে।

৩. ঘৃণ্য ও ন্যাক্কারজনক অনৈতিক আচরণে গভীরতা অর্জন করা। যেন ঘৃণ্য থেকে ঘৃণ্যতর কাজগুলো সম্পন্ন হওয়ার ক্ষেত্রে জটিলতা দেখা না দেয়।

জায়নবাদি পরিকল্পনার গোপন দস্তাবেজ

এগুলো হলো এমন কিছু দস্তাবেজ, যা বৈশ্বিক জায়নবাদের প্রবর্তক থিওডর হের্জল[১] ১৮৯৭ ঈসাব্দে জায়নবাদিদের প্রথম বিশ্বসভায় উপস্থাপন করেছিল। সেই দস্তাবেজগুলোকে *'জায়নবাদি বুদ্ধজীবিদের গোপন প্রটোকলস'* বলা হয়।

প্রটোকলসে কী আছে?

সেখানে বলা আছে—

১. আমাদের পাসপোর্ট/আমাদের পরিচয় পত্র... শক্তি, মিথ্যা ও দাবিসর্বস্ব হবে।

২. আমাদের শক্তিই হবে আমাদের অধিকার। [অর্থাৎ শক্তি দিয়ে যেকোনো ইচ্ছা পূরণ করব।]

৩. আমাদের স্বাধীনতা যদিও আইনের সীমারেখার ভেতরে থেকে বিভিন্ন

[১] থিওডোর হের্জল (Theodor Herzl) ছিলেন অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরির একজন ইহুদি সাংবাদিক ও লেখক। তিনি বেঞ্জামিন জে'ইভ হার্জল হিসেবে জন্মগ্রহণ করেন। তাকে অধুনিক ইহুদি রাজনীতির জনক এবং ইসরায়েল রাষ্ট্রের জনক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। —অনুবাদক

পদক্ষেপ ও সংগ্রাম-সাধনার মাধ্যমে অর্জিত হবে; কিন্তু সকল আইন হবে আমাদের ইচ্ছানুযায়ী। সবধরনের স্বাধীনতার ওপর আমাদের একচ্ছত্র আধিপত্য থাকবে। আমরা স্বাধীনতার এমন কিছু আকার জন্ম দেব, যেখানে আমাদের ইচ্ছার পূর্ণ প্রতিফলন ঘটবে।

৪. আইন প্রণয়ন, নির্বাচন, সাংবাদিকতা ও প্রচারমাধ্যম (মিডিয়া) আমাদের করতলগত থাকবে।

৫. পৃথিবীর সকল খাদ্যোপকরণ আমাদের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকবে। কাজেই ক্ষুধার তাড়নায় অন্যরা আমাদের সামনে অপদস্থ ও মুখাপেক্ষী হয়ে থাকবে।

৬. আন্তর্জাতিক জটিলতাগুলোর নিরসন আমরা এমনভাবে করব, যা আমাদের স্বার্থের ষোলোআনা পূরণ করবে।

৭. আমরা রাষ্ট্র ও জনগণের মাঝখানে পরিখা খনন করে রাখব।

৮. আমাদের হাতে দুটি বড় হাতিয়ার থাকবে। সাহিত্য ও সাংবাদিকতা।

৯. আমরা বিশ্বের শাসক হয়ে আমাদের বিশ্বাস ব্যতিরেকে অন্য সব বিশ্বাসের অস্তিত্ব বিনাশ করব।

১০. পুরো পৃথিবীর ইহুদি সম্রাটই পোপ হবে। এই লক্ষ্যপূরণ করার জন্যে আমরা অন্যধর্মের সকল নেতৃবৃন্দ (খ্রিস্টান পাদরি, মুসলমান উলামা ও হিন্দু পণ্ডিত) দের ক্ষমতা ও প্রভাব খর্ব করে দেব।

১১. আমাদের হয়ে যারা কাজ করবে, তাদের মুখে সবসময় স্বচ্ছলতা, শান্তি ও নিরাপত্তা এবং আন্তর্জাতিক ঐক্যের শ্লোগান থাকবে। তারা কখনই এ কথা প্রকাশ করবে না যে, এই আন্তর্জাতিক ঐক্য বলতে আমাদের উদ্দেশ্য হলো, সবাইকে ইহুদি প্রবাহে প্রবাহিত করা।

১২. পৃথিবীর কোথাও যদি আমাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ওঠে তাহলে সেই প্রতিবাদও আমাদের পরামর্শে, আমাদের সিদ্ধান্তে আয়োজিত হবে। অর্থাৎ আমরাই প্রতিটি জাতির মাঝে আমাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদকারী দাঁড় করাব। উদ্দেশ্য হলো, এর মাধ্যমে আবেগ-উদ্দীপনা জাগ্রত থাকবে।

১৩. পৃথিবীতে রাষ্ট্রের চালিকা আমরাই ঘোরাব।

১৪. পত্র-পত্রিকায় (অর্থাৎ সবধরনের প্রচারযন্ত্রে) কোনো সংবাদ আমাদের মর্জির বাইরে প্রকাশ পাবে না।

সংক্ষেপে আমরা থিওডর হের্জলের রচিত প্রটোকলসের কিছু অংশ তুলে ধরলাম। এই দস্তাবেজের সবগুলো ধারায় শয়তানি মনোবৃত্তি ও শঠতাপ্রসূত ষড়যন্ত্রের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে।

বিভিন্ন ইহুদি সংগঠন ও আন্দোলন

ইহুদিদের অনেকগুলো সংগঠন ও আন্দোলন রয়েছে। কিছু সংগঠন গোপনে কার্যক্রম পরিচালনা করে। আর কিছু সংগঠন প্রকাশ্যে কাজ করে। গোপন সংগঠনগুলো হলো—

১. ট্যাম্পেলার্স
২. ফ্রি ম্যাসনরি (الماسونية)
৩. ইলুমিনাতি সংগঠন

আর তাদের প্রসিদ্ধ আন্দোলনগুলো হলো—

১. জায়নবাদ (Zionism) / সাহইয়াওনিয়্যত
২. এলিজাহ আন্দোলন

প্রকাশ্য বড় সংগঠনগুলো হলো—

১. বিনি বার্থ সোসাইটি
২. লায়ন্স ক্লাব
৩. রোটারি ক্লাব

এর বাইরে ইহুদিদের হাতে আরো কিছু আন্তর্জাতিক সংস্থার নিয়ন্ত্রণও রয়েছে। যেমন, লিগ অফ নেশন্স ও জাতিসংঘ। নিম্নে আমরা তাদের সেই সংগঠন ও আন্দোলনগুলোর পরিচিতি তুলে ধরছি—

ট্যাম্পেলার্স

ট্যাম্পেলার্সের আত্মপ্রকাশ ঘটে হিজরি পঞ্চম শতাব্দী, মুতাবেক ঈসায়ি একাদশ শতাব্দীতের শেষ দিকে, যখন প্রথম ক্রুসেড যুদ্ধ শুরু হয় এবং ক্রুসেডাররা বাইতুল মাকদিস দখল করে ফেলে। তারা পুণ্য ভূমিগুলোর

নিরাপত্তার নাম দিয়ে নিজেদের এমন একটি সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলে, যা ইউরোপের সকল সেনাবাহিনী থেকেও অধিক দক্ষ, চৌকষ ও দৃঢ়। উন্মাদ প্রকৃতির খ্রিস্টানদেরকে এই সেনাবাহিনীর সদস্যপদে ভর্তি করা হতো; কিন্তু কমান্ডার হতো শুধু ইহুদিরাই। কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত এই দলটিকে ক্রিশ্চিয়ান ফৌজ মনে করা হতো। ক্রুসেডীয় যুদ্ধগুলোতে যখন খ্রিস্টানরা একের পর এক যুদ্ধে হারতে শুরু করে তখন বাধ্য হয়ে ট্যাম্পেলার্স শামদেশ থেকে বেরিয়ে ইউরোপে শক্ত অবস্থান নিয়ে থিতু হয়। এই ফৌজের সদস্যদের একের পর এক বিশৃঙ্খল কর্মকাণ্ডের কারণে বিরক্ত হয়ে ১৩১২ ঈসাব্দে ট্যাম্পেলার্স সংগঠনটির অস্তিত্ব গুটিয়ে ফেলা হয়। এতদসত্ত্বেও এই দলটির সদস্যরা নিজেদের কার্যক্রম বন্ধ করেনি। তারা নতুন অবয়বে আত্মপ্রকাশ করে। তাদের অনেক সদস্য 'অর্ডার অফ ক্রাইস্ট' নামে একটি সংগঠন তৈরি করে সামুদ্রিক বাণিজ্য ও জলদস্যুবৃত্তি শুরু করে দেয়। কিছু সদস্য ফ্রি ম্যাসনরি সংগঠনে অন্তর্ভুক্ত হয়। এক পর্যায়ে এরাই সংগঠনের চিন্তাধারা ও বিশ্বাসকে নিজেদের অনুগত করে ফেলতে সক্ষম হয়। কাজেই বর্তমান ফ্রি ম্যাসনরি পূর্বের সেই ট্যাম্পেলার্সের নতুন নাম মাত্র।

২. ফ্রি ম্যাসনরি (الماسونية)

গুপ্ত ইহুদি সংগঠনগুলোর মধ্য হতে এটিই সবচেয়ে প্রাচীন ও প্রভাব বিস্তারকারী সংগঠন। এরা নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি, লক্ষ্য, পদ্ধতি ও আক্রমণ পূর্ণ গোপনীয়তার সঙ্গে পরিচালনা করে থাকে।

এরা বিশ্বের সবধরনের কর্মকাণ্ড পাখির চোখে পর্যবেক্ষণ করে থাকে। সংগঠনটিতে অনেকগুলো স্তর ও শ্রেণি রয়েছে। প্রথম স্তরে যেকোনো ধর্ম, জাতি ও প্রজন্মের লোক প্রবেশ করতে পারে। এধরনের সদস্যের সংখ্যা কয়েক লাখ। দ্বিতীয় স্তরে শুধু ইহুদিরাই প্রবেশ করতে পারে। আর তৃতীয় স্তরে সারা পৃথিবীর অল্প কিছু বাছাইকৃত নির্বাচিত ইহুদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সবগুলো স্তর ও পদবিধারীদের উপরে ফ্রি ম্যাসনরির প্রধান অধিষ্ঠিত থাকে। তাকে 'প্রধান' বা 'সর্বমহান হাখাম' বলা হয়। কিন্তু এর ব্যক্তিত্ব সবসময় গোপন থাকে।

সংগঠনটির নীতিমালা ও বিধি-বিধান অত্যন্ত কড়া। প্রত্যেক সদস্য তা মেনে চলতে বাধ্য। প্রত্যেক সদস্য শুধু নিজের স্তরের সদস্যদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে পারবে। একই ডিভিশনের সদস্যরা একে অপরকে একটি বিশেষ সাংকেতিক পরিচয়ের মাধ্যমে চিনতে পারে। চেনার এই সাংকেতিক কোড সবসময় পরিবর্তিত হতে থাকে।

লক্ষ্য-উদ্দেশ্য

ফ্রি ম্যাসনরির প্রতীক ও বাহ্যিক লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হলো, 'ন্যায্যতা, ভ্রাতৃত্ব ও স্বাধীনতা'। ফ্রি ম্যাসনরি এ দাবি করে যে, আমাদের সংগঠনে জাতি, রাষ্ট্র ও ধর্মভিত্তিক কোনো বিভাজন নেই। আমরা আমাদের কর্মতৎপরতার মাধ্যমে যথাসম্ভব সহযোগিতার একটি আদর্শ পরিবেশ সৃষ্টি করতে চাই। কিন্তু এই চিত্তাকর্ষক মনোলোভা দাবির আড়ালে তারা তাদের আসল লক্ষ্য—

১. ইহুদিদের নিরাপত্তা বিধান ও ইহুদিজম প্রতিষ্ঠা।
২. অন্য সবগুলো ধর্মের বিলোপ।
৩. ধর্মহীনতার বিস্তার ঘটাতে বদ্ধপরিকর।

১. ইহুদিদের নিরাপত্তা ও ইহুদিজমের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা

ইহুদিদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ও সমগ্র বিশ্বে ইহুদিধর্মের বিজয় প্রতিষ্ঠা করাই ফ্রি ম্যাসনরির মূল লক্ষ্য। ইহুদি নেতা হাখাম ইসহাক ওয়াইযা স্বীকার করেছে,

> 'ফ্রি ম্যাসনরি আন্দোলন একটি ইহুদি সংগঠন। যার ইতিহাস, সবগুলো র‍্যাংক, পদোন্নতি, শিক্ষা ও গুপ্ত বাণীসমূহের আদ্যোপান্ত ইহুদিনির্ভর।'

১৯০১ ঈসাব্দে প্রকাশিত European Free Masonry (ইউরোপিয়ান ফ্রি ম্যাসনরি) এর মাঝে আছে—

> 'ইউরোপিয়ান ফ্রি ম্যাসন (European Free Mason) এমন একটি ভবন নির্মাণ করবে, যেখানে বনু ইসরাইলের খোদাওয়ান্দ সবসময় অবস্থান করবেন।'

২. অন্য সবগুলো ধর্মের বিলোপ

ইহুদিরা চায়, অন্যধর্মগুলো বিলুপ্ত করে ধর্মহীন বিশ্ব তৈরি করা। যদি তাই করা যায় তাহলে বিশ্বাসশূন্য অন্তরগুলোতে ইহুদিজমের বীজ বপন করার কাজ সহজ হবে। এই উদ্দেশ্য চরিতার্থের কাজে ফ্রি ম্যাসনরি আদাজল খেয়ে কাজ করে যাচ্ছে। ইহুদিদের প্রটোকলসে লেখা আছে—

> 'ফ্রি ম্যাসনরি— যারা গোটা পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে তারা আমাদের সহায়তা করছে। আমাদের কর্তব্য হবে, আমরা ঈমানি বিশ্বাসের শেকল ভেঙে ফেলব। যখন আমরা আমাদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হব তখন আমাদের বিশ্বাস ব্যতিরেকে অন্য কোনো বিশ্বাসের অস্তিত্ব রাখব না। কাজেই আমাদেরকে অবশ্যই সকল ধর্ম ও সব ধরনের বিশ্বাস বিনাশ করতে হবে।'

৩. ধর্মহীনতা, নাস্তিকতা ও মুক্তমনা মতবাদের বিস্তার

ফ্রি ম্যাসন পৃথিবীবাসীকে জন্তুদের মতো অবাধ যৌনতায় অভ্যস্ত করিয়ে নিজেদের নিকৃষ্ট লক্ষ্য পূরণ করা এবং তাদেরকে বর্তমান ও ভবিষ্যতের সবধরনের বিপদাপদ থেকে উদাসীন করে রাখতে চায়। জিউস ইন্সাইক্লোপিডিয়ার মাঝে লেখা আছে—

> 'আমরা এমন জনগোষ্ঠী সৃষ্টি করতে চাই, যারা নিজেদের গুপ্তাঙ্গের ব্যাপারে কোনো ধরনের লজ্জা, সংকোচ অনুভব করবে না। আমরা চাই, যুবকরা যেন মনে করে, জন্মের সময়কাল থেকেই গুপ্তাঙ্গ পবিত্রতার অধিকারী।' [জিউস ইন্সাইক্লোপিডিয়া। এডিশন : ১৯০৩। খণ্ড : ৫। পৃষ্ঠা : ৫০৩]

ফ্রি ম্যাসনরির ইতিহাস

ইহুদিদের দাবি হলো, ফ্রি ম্যাসনরির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয় ওই যুগে, যখন বনি ইসরাইল ফারাওদের অধীনে পিরামিড তৈরি করছিল। ওই দুঃসময়েও বনি ইসরাইলি রাজমিস্ত্রীরা নিজেদের ঐতিহ্যগত আমিত্ব ত্যাগ করেনি এবং নিজেদের একটি স্বাধীন অবস্থান ধরে রাখার সর্বোত

প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছে। এভাবে তারা ফ্রি ম্যাসন (মুক্ত ভবন) কেন্দ্রিক সমাজ গড়ে তোলার কার্যক্রম শুরু করে। মুসা আলাইহিস সালাম ও সুলাইমান আলাইহিস সালামের যুগেও তারা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখে। বনি ইসরাইলের পতনযুগে ইহুদি নেতৃবর্গ নিজেদের ঐক্য বজায় রাখার জন্যে বিশেষ কাউন্সিল আয়োজনের কাজ শুরু করে। এগুলোকে লজ (Lodge) বলা হতো। সেখানে তারা নিজেদের সাংগঠনিক কাঠামো ও নিয়ম-নীতি অক্ষুণ্ন রাখা ও নিজেদের সোনালি যুগ ফিরে পাওয়ার জন্যে বিভিন্ন পরিকল্পনা তৈরি করত। ইহুদিদের সেই বড় বড় ধর্মীয় নেতাদের সম্পর্ক ছিল ওই রাজমিস্ত্রী ও পাথর ভাঙার দায়িত্ব পালনকারী পরিবারগুলোর সঙ্গে। পাথর ভাঙাকে ইংরেজিতে 'ম্যাসন' বলা হয়। সেই সম্পর্কের কারণে সংগঠনটিকে 'মুক্ত রাজমিস্ত্রীদের সংগঠন' বা ফ্রি ম্যাসনরি' বলা হয়।

ঐতিহাসিক সত্যতার বিচারে 'ফ্রি ম্যাসনরি' এর বুনিয়াদ এতোটা প্রাচীন হওয়ার কোনো প্রমাণ নেই। ফ্রি ম্যাসনরি নামটি সর্বপ্রথম অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রসিদ্ধি লাভ করে যখন এই সংগঠন ইংল্যান্ডের মাটিতে খুব দ্রুততার সঙ্গে শেকড় ছড়াতে শুরু করে। ১৭১৭ সালে ইংল্যান্ডে 'গ্রান্ড লজ' প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর পৃথিবীর যেখানেই ইংরেজদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেখানে ফ্রি ম্যাসনরির কেন্দ্রও প্রতিষ্ঠা করার ধারাবাহিক কার্যক্রম শুরু হয়ে যায়। কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, মিসর, মধ্যপ্রাচ্যসহ সবগুলো ইংরেজ অধিকৃত অঞ্চলে সংগঠনটির ডাল-পালা গজিয়ে উঠতে শুরু করে।

ফ্রি ম্যাসনরি ১৭৮৯ সালে ফরাসি বিপ্লব সম্পন্ন করার মাধ্যমে ফরাসি রাজতন্ত্রের পতন ঘটায় ও ইউরোপে গণতন্ত্রের সূচনা করে। তুর্কিস্তান থেকে খিলাফত উচ্ছেদের কার্যক্রমেও ফ্রি ম্যাসনরি সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষাংশে কর্মতৎপর তুর্কি যুবকদের গুপ্ত সংগঠন 'জাতীয় ঐক্য ও অগ্রগতি দল' যেই বিপ্লবের এজেন্ডা নিয়ে মাঠে নেমেছিল, সেটা ছিল এই ফ্রি ম্যাসনরিদেরই পরিচালিত সংগঠন। ফ্রি ম্যাসনরির এজেন্টরা তিন মহাদেশে বিস্তৃত ইসলামি খিলাফাহর স্থলে একটি সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী দুর্বল ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে

দেখাতে সমর্থ হয়। ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় বলশেভিক বিপ্লব সংঘটিত হয়। ওই বিপ্লবেও ফ্রি ম্যাসনরি পূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। আধুনিক তুরস্কের জনক মুসতফা কামাল, আফগানিস্তানের শাসক হাবিবুল্লাহ খান, ইরানের সাবেক রাজা রেযা শাহ পেহলভি, মিসরের সাবেক রাষ্ট্রপতি জামাল আবদুন নাসের ও আনওয়ার সাদাত এবং ফিলিস্তিনি লিডার ইয়াসির আরাফাতের মতো জাতীয় নেতারা এই ফ্রি ম্যাসনরির এজেন্ট ছিল।

মানুষ কেন ফ্রি ম্যাসনরির দিকে ঝুঁকছে?

অল্প সময়ে অধিক থেকে অধিকতর খায়েশ চরিতার্থ করার জন্যেই মানুষ ফ্রি ম্যাসনরিতে যোগদান করে থাকে। ব্যক্তিস্বার্থ ও নিজস্ব মুনাফার পূজারীরাই ফ্রি ম্যাসনরির জালে ফেঁসে যায়। বিশেষ ঘরানার লোক, যেমন শাসক, রাজনীতিবিদ, মন্ত্রী, কূটনীতিবিদ, গণশাসক, সামরিক কর্মকর্তা, বড় ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, বিজ্ঞানী, ডক্টর, চিন্তাবিদ ও জ্ঞানী-গুণী, এরা সাধারণত জনপ্রিয়তা, সামাজিক অবস্থান ও অধিক প্রাচুর্য্যের কাঙাল হয়ে থাকে। এই সংগঠনে যোগদানের সময় সদস্যপদপ্রার্থীর কাছ থেকে এ মর্মে শপথ নেওয়া হয় যে, সে কোনো ধরনের গুপ্ত কথা প্রকাশ করবে না। এর অন্যথা হলে তাকে প্রাণে মেরে ফেলা হবে। সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পর তাকে পরীক্ষামূলক বিভিন্ন কাজ দেওয়া হয়। সেগুলোর সফলতার ওপর নির্ভর করে তার পরবর্তী স্তরের উন্নতি।

৩. ইলুমিনাতি সংগঠন (Order of illuminaty)

এই সংগঠন ১ মে ১৭৭৪ ঈসাব্দে এমন কিছু ইহুদিদের হাতে প্রতিষ্ঠিত হয়, যারা লুসিফর (Lucifer) অর্থাৎ শয়তানকে নিজেদের প্রভু মানে এবং তার পূজা করে। দাজ্জালকে মাসিহাহ অর্থাৎ উদ্ধারকর্তা বিশ্বাস করে। এই সংগঠনের সদস্যরা মানুষকে ধোঁকা দেওয়ার জন্যে এ কথা প্রচার করে যে, সংগঠনটির উদ্দেশ্য হলো, জাতি, ধর্ম, সামাজিক অবস্থান ও পেশার উর্ধ্বে উঠে মানবজাতিকে একটি স্বচ্ছল সমাজের অংশ বানানো। কিন্তু তাদের মূল উদ্দেশ্য হলো, প্রথমে সকল ধর্ম, সকল রাষ্ট্র,

সকল ব্যক্তিগত সম্পত্তি, দেশপ্রেম ও পারিবারিক বন্ধন ধ্বংস করা। এরপর একটি বৈশ্বিক ইবলিসি রাজত্ব গড়ে তোলা। ১৬ জুলাই ১৯৮২ ঈসাব্দের পর থেকে ফ্রি ম্যাসনরি ও ইলুমিনাতি একটি চুক্তির অধীনে এক ও অভিন্ন প্লাটফর্মে যোগদান করে। কেননা উভয় সংগঠনের উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন।

ইহুদিদের বিভিন্ন আন্দোলন

১. সাহ্ইয়ূনিয়্যাহ বা জায়নবাদ (Zionism)

এটি ইহুদিদের সবচেয়ে প্রাচীন ও সবচেয়ে বেশি প্রভাবশালী আন্দোলন। যার নামকরণ হয়েছে বাইতুল মাকদিসের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত 'সাহ্ইয়ূন' নামের একটি পাহাড়ের দিকে সম্বন্ধিত করে। এই আন্দোলনটি মূলত বনি ইসরাইলের হৃত সম্মান পুনরুদ্ধার, আকসার স্থলে হাইকাল নির্মাণ ও সমগ্র পৃথিবীর ওপর এক ইহুদি সম্রাটের মাধ্যমে রাজত্ব করার অভিলাস পূরণের উদ্দেশ্য গঠিত হয়। এই ইহুদি সম্রাটের নাম 'কানা দাজ্জাল'।

এটি খুবই প্রাচীন আন্দোলন। সাহ্ইয়ূনে প্রত্যাবর্তন, হায়কালের পুনর্নির্মাণ ও সমগ্র বিশ্বজয়ের এই আবেগ সর্বপ্রথম সৃষ্টি হয়, যখন ইহুদিরা বুখতে নাসরের গোলামি থেকে স্বাধীন হয়ে ফিলিস্তিন ফিরে আসে। ওই সময় যে আন্দোলনটি শুরু হয় তার নাম ছিল 'মুকাবিয়্যিন আন্দোলন'। এরপর এ ধরনের আরো কিছু আন্দোলন বিভিন্ন যুগে পরিলক্ষিত হয়েছে। কিন্তু সবগুলো আন্দোলনই শেষ পর্যন্ত মুখ থুবড়ে পড়ে। অষ্টাদশ ঈসায়ি শতাব্দীতে ফ্রি ম্যাসনরি ও ইহুদি চিন্তাবিদদের তৎপরতার ফলে ইউরোপের অনেকগুলো রাষ্ট্র একটি পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ইহুদি আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে। ইউরোপিয়ান শাসকরা মূলত ইউরোপকে ইহুদিদের ফ্যাসাদ থেকে পবিত্র করা ও তাদের মাধ্যমে মুসলিমদের পরাজিত করার ভাবনা থেকেই ইহুদিদের সমর্থন শুরু করেছিল। ইউরোপিয়ান শাসকবর্গের মধ্য সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো ফ্রান্সের নেপোলিয়ান। সে ইহুদিদের সঙ্গে অঙ্গীকার করে যে, ইহুদিরা মধ্যপ্রাচ্য দখল করার অভিযানে তাকে আর্থিক সহায়তা করবে। বিনিময়ে সে ফিলিস্তিনে তাদের জন্যে একটি স্বাধীন

রাষ্ট্র এনে দেবে; কিন্তু এই পরিকল্পনা ভেস্তে যায়। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইহুদি নেতারা ফিলিস্তিনে জমি কেনার পরিকল্পনা শুরু করে দেয়। এই কার্যক্রমকেই 'এলিজাহ আন্দোলন' বলা হতো।

১৮৯২ সালে আন্তর্জাতিক জায়নবাদি আন্দোলন শুরু হয়। যার প্রতিষ্ঠাতা হলো অস্ট্রিয়ার সাংবাদিক থিওডোর হার্জেল। সে তার 'ইহুদি রাজ্য' বইয়ে নীলনদ থেকে শুরু করে ফোরাত নদী পর্যন্ত বিস্তৃত একটি বিশাল ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে, ফিলিস্তিনকে রাজধানী বানিয়ে একজন বিশ্বজয়ী ইহুদি সম্রাটের রাজত্বের পথ সুগম করার বিশদ পরিকল্পনা উপস্থাপন করে। সে ১৮৯৭ সালে সুইজারল্যান্ডের বাসেল নগরীতে জায়নবাদিদের প্রথম বার্ষিক কনফারেন্সে ঘোষণা করে যে, 'আমরা আজ ইহুদিদের বিশ্বজয়ের প্রথম পাথর গেথে দিলাম। অদূর ভবিষ্যতে পৃথিবী আমাদের পদতলে ধরা দেবে।' ওই কনফারেন্সে সর্বপ্রথম 'জায়নবাদি বুদ্ধিজীবিদের প্রটোকলস' উপস্থাপন করা হয়।

১৯০১ সালে ইহুদিরা বড় অংকের অর্থের প্রস্তাব দিয়ে খলিফাতুল মুসলিমিন সুলতান আবদুল হামিদ দ্বিতীয়ের কাছ থেকে ফিলিস্তিনের জমিন দাবি করে; কিন্তু সুলতান পরিষ্কার ভাষায় নাকচ করে দেন। অবশেষে জায়নবাদিরা উসমানি খিলাফাহ দুর্বল করার জন্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ছড়িয়ে দেয়। উসমানি খিলাফাহর বিলুপ্তির মাধ্যমে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে। তুর্কিস্তানের নৌবন্দরগুলো বণ্টন করে শামদেশ ও আরব রাষ্ট্রগুলোর ওপর বৃটিশ ও ইহুদি এজেন্টদেরকে চাপিয়ে দেওয়া হয়। ১৯১৭ সালে বৃটেন ঘোষণা করে যে, 'ফিলিস্তিন ইহুদিদের। এই ভূমির ওপর তাদের অধিকার।'

এর তিন দশক পর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ে। তখন জায়নবাদিদের হাতে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কিছু দিন পর 'ইসরাইল প্রতিষ্ঠার ঘোষণাপত্র' অনুমোদন করিয়ে নেওয়া হয়। ১৪ মে ১৯৪৮ সালে ইসরাইল প্রতিষ্ঠার ঘোষণা জানিয়ে দেওয়া হয়। জায়নবাদিরা এখানেই থেমে থাকেনি, তারা বরং ইসরাইলের আশপাশের ইসলামি রাষ্ট্রগুলোর ওপর একের পর এক আক্রমণ চালাতে থাকে। এক

পর্যায়ে ৫ জুন ১৯৬৮ সালে তারা বাইতুল মাকদিস দখল করে নেয়। জায়নবাদিরা মসজিদে আকসা ধ্বংস করার জন্যে এর নিচে অনেকগুলো সুরঙ্গ খনন করেছে। উদ্দেশ্য হলো, যেন মামুলি ভূমিকম্পেই মসজিদ ধসে পড়ে। তাহলে তারা এর ওপর সুলাইমানি হায়কাল নির্মাণ করার অজুহাত পেয়ে যাবে। তারা মনে করে, সুলাইমানি হায়কাল নির্মিত হলে বিশ্বজয়ী ইহুদি সম্রাটের আগমন নিশ্চিত হবে।

২. এলিজাহ আন্দোলন

এলিজাহ আন্দোলন দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ওই আন্দোলন, যার অধীনে ইউরোপসহ সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে থাকা ইহুদিদেরকে ফিলিস্তিনে ফিরে এসে, সেখানে নিবাস পাতার আহ্বান জানানো হয়। এই আন্দোলন ইতিহাসের ছয়টি যুগ অতিক্রম করে সামনে অগ্রসর হয়েছিল—

১. প্রথম এলিজাহ আন্দোলন ১৮৮১ সালে শুরু হয়। যখন রাশিয়া থেকে অনেক ইহুদি পালিয়ে ফিলিস্তিনে থিতু হয়েছিল। ইহুদি পুঁজিপতিরা ও রোথশিল্ড ফিলিস্তিনের মাটিতে সেই ইহুদিদের আবাসস্থল তৈরি করার জন্যে পানির মত সম্পদ বইয়ে দিয়েছিল; কিন্তু সেই আন্দোলন অবশেষে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

২. দ্বিতীয় এলিজাহ আন্দোলন ১৯০৪ ঈ. থেকে ১৯১৪ পর্যন্ত বেগবান থাকে। ওই সময় চল্লিশ হাজার ইহুদি ফিলিস্তিনে চলে আসে। তাদেরকে কিব্বুজ সিস্টেমের অধীনে আবাদ করা হয়েছিল। সেখানে জমি ও ভূসম্পত্তির ওপর কোনো ব্যক্তিমালিকানা ছিল না। সবাই মিলে কাজ করত।

৩. তৃতীয় এলিজাহ আন্দোলন ১৯১৯ থেকে ১৯২৩ পর্যন্ত চলমান থাকে। এ সময় যেসব নতুন ইহুদি বসতি স্থাপনকারী ফিলিস্তিনে আসে। তারা কৃষিকাজের পাশাপাশি বাণিজ্যিক কার্যক্রমও শুরু করে দিয়েছিল। খুব দ্রুতই তারা ফিলিস্তিনের ব্যবসা-বাণিজ্যের গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে নেয়।

৪. চতুর্থ এলিজাহ আন্দোলন ১৯২৩ ঈ. থেকে ১৯২৯ ঈসাব্দ পর্যন্ত চলমান থাকে। এ সময় প্রায় ৮২ হাজার ইহুদি রাশিয়া, পোল্যান্ড,

রোমানিয়া ও অন্যান্য রাষ্ট্র থেকে ফিলিস্তিনে এসে থিতু হয়। ওই সময় প্রচুর ফিলিস্তিনি জমি গায়ের জোরে দখল করা হয়।

৫. পঞ্চম এলিজাহ আন্দোলন ১৯২৯ ঈ. থেকে ১৯৩৯ ঈ. পর্যন্ত চলতে থাকে। এ সময় ইহুদি বসতি স্থাপনকারীর সংখ্যা আড়াই লক্ষ ছাড়িয়ে যায়।

৬. ষষ্ঠ যুগ ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৫ ঈ. পর্যন্ত বিস্তৃত। এ সময় প্রায় দেড় লক্ষ ইহুদিকে সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে ফিলিস্তিনে বসতি তুলতে দেওয়া হয়। ১৯৪৮ সালে ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এলিজাহ আন্দোলনের সমাপ্তি ঘটে।

ইহুদিদের প্রকাশ্য সংগঠন

১. বিনি বার্থ সোসাইটি

বিনি বার্থ শব্দের অর্থ, 'অঙ্গীকারের সন্তান'। এক জার্মান ইহুদি ১৭৪৩ ঈসাব্দে সর্বপ্রথম এই সোসাইটি তৈরি করে। এটি ফ্রি ম্যাসনরির সহায়ক সংগঠন। যার দায়িত্ব, প্রকাশ্য কার্যক্রমগুলো সম্পন্ন করে ফ্রি ম্যাসনরির পথ সুগম করা। ফ্রি ম্যাসনরির বড় বড় দায়িত্বশীলরা বাহ্যিক জীবনে এই সোসাইটির সঙ্গে নিবীড় সম্পর্ক বজায় রাখে।

২. লায়ন্স ক্লাব (THE LIONS' CLUB)

লায়ন্স (LIONS) শব্দটি মূলত Liberty, Intelligence our Nations safety এর সংক্ষিপ্ত রূপ। যার অথ হলো, স্বাধীন আচরণ ও বুদ্ধিমত্তাই আমাদের জাতির নিরাপত্তা। লায়ন্স ক্লাবের মাঝে এমন লোকদের নেওয়া হয়, যারা পুঁজি, জ্ঞান অথবা পদ-পদবির বিচারে অসাধারণ হয়ে থাকে অথবা কোনো ক্ষেত্রে অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী হয়ে থাকে। লায়ন্স ক্লাবের দুটি বড় লক্ষ্য রয়েছে—

১. পৃথিবীর বুকে সেক্যুলারিজম ছড়িয়ে দেওয়া।
২. নতুন প্রজন্মের মস্তিষ্ক জায়নবাদি লক্ষ্যের জন্যে সুগম করা।

৩. রোটারি ইন্টারন্যাশনাল (Rotary International)

১৯০৫ সালে ইহুদিদের এই আন্তর্জাতিক সংগঠনটির গোড়াপত্তন করে পল হ্যারিস নামের এক মার্কিন আইনবিদ। সংগঠনটি বিভিন্ন দেশে জনকল্যাণমূলক ও উন্নয়নধর্মী পরিকল্পনার মাধ্যমে নিজেদের প্রতিষ্ঠার বৈধতা প্রমাণিত করে। বর্তমানে পৃথিবীর ১৫৭ রাষ্ট্রে এর অধীনে প্রায় তিন হাজার ক্লাব রয়েছে। যার সদস্যসংখ্যা ১২ লক্ষাধিক।

ইহুদি নিয়ন্ত্রিত আন্তর্জাতিক সংস্থা

১. লিগ অফ নেশন্স (League of Nations)

এটি প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৬ ঈসাব্দ থেকে ১৯১৮ পর্যন্ত) এর পর প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংস্থা প্রতিষ্ঠার বাহ্যিক কারণ দেখানো হয়েছিল, এমন একটি আন্তর্জাতিক প্লাটফর্ম তৈরি করা, যা পৃথিবীর সবগুলো রাষ্ট্রের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারবে এবং পৃথিবীতে শান্তি ও নিরাপত্তা বিধান করতে সক্ষম হবে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধশেষে এই লিগ অফ নেশন্স (League of Nation) এর মাধ্যমেই সেই চুক্তি সম্পন্ন হয়, যার মাধ্যমে উসমানি খিলাফাহ বিলুপ্ত হয়েছিল।

২. জাতিসংঘ (United Nations Organization)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৪৬ সালে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এর দু' বছর পর ইসরাইল প্রতিষ্ঠিত হয়, যার বাড়াবাড়ি ও সীমালংঘনধর্মী কাজগুলো জাতিসংঘ সবসময় দেখেও না দেখার অভিনয় করে এসেছে। শামদেশ, জর্ডান, মিসর ও লেবাননের ওপর ইসরাইলের অসংখ্য বর্বর আক্রমণের বিরুদ্ধে কোনো ধরনের শাস্তিমূলক পদক্ষেপ জাতিসংঘ নেয়নি। ইসরাইল কর্তৃক ১৯৬৬, ১৯৭৩ ও ১৯৮২ এর যুদ্ধে আরবদের গণহত্যা ও সর্বধরনের নিষিদ্ধ অস্ত্রের ব্যবহার করাকে জাতিসংঘ কখনই সন্ত্রাসবাদ অভিহিত করেনি। ২০০০ সাল থেকে অদ্যাবধি ফিলিস্তিনের মাটিতে ইসরাইল একের পর এক রক্ত ঝরিয়ে চলছে, অথচ জাতিসংঘ কখনই সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করেনি। এই বাস্তবতা আমাদের চোখে এ প্রমাণিত সত্য আঙুল তুলে দেখিয়ে দিচ্ছে যে, জাতিসংঘ মূলত ইহুদিদের বৈশ্বিক প্রাধান্য বিস্তারের হাতিয়ার।

খ্রিস্টধর্ম

খিস্টধর্ম এমন একটি ধর্ম, যা বিগত চৌদ্দ শ বছর ধরে ইসলামের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে লড়াই চালিয়ে আসছে। এমন নয় যে, তারা শুধু সামরিক ময়দানেই তাদের বৈরীতা ও শত্রুতা প্রদর্শন করেছে; বরং এর বাইরে বুদ্ধিবৃত্তিক ও আদর্শিক রণক্ষেত্রগুলোতেও তারা তাদের বৈরীতার ঘোলোকোঠা পূরণ করে চলেছে।

খ্রিস্টধর্মের সংজ্ঞা

ইনসাইক্লোপিডিয়া বৃটানিকায় খ্রিস্টধর্মের সংজ্ঞা লেখা আছে—

> 'এটি এমন ধর্ম, যা নিজের শেকড় সম্বন্ধিত করে নাসেরার অধিবাসী 'ইয়াসু'-এর দিকে। এবং তাকে প্রভুর নির্বাচিত মাসিহ বিশ্বাস করে।' [খণ্ড- ৫, পৃষ্ঠা- ৬৯৩]

খ্রিস্টধর্মের মৌলিক বিশ্বাস

খ্রিস্টধর্মের মৌলিক বিশ্বাসগুলো হলো—

১. ত্রিত্ববাদে বিশ্বাস
২. মাসিহ ঈশ্বরপুত্র
৩. হুলুল (Incarnation)-এ বিশ্বাস
৪. ঈসা মাসিহের ক্রুশবিদ্ধ হওয়া (Crucifixion) এর বিশ্বাস
৫. মাসিহের পুনর্জন্মে বিশ্বাস
৬. মাসিহের প্রত্যাবর্তনের ওপর বিশ্বাস
৭. প্রায়শ্চিত্তের বিশ্বাস।

১. ত্রিত্ববাদ

ত্রিত্ববাদে বিশ্বাসের ব্যাখ্যা হলো, প্রভু হলেন তিন সত্তার সমন্বিত রূপ। পিতা (প্রভু) সন্তান (ঈসা), রুহুল কুদস (পবিত্র জীবন)।

রোমান খ্রিস্টানদের সেকেলে ও প্রভাবশালী ফেরকা ক্যাথলিক চার্চের বিশ্বাস হলো, এই তিন সত্তার সমন্বয়ে একটি মৌলিক কাঠামা গড়ে ওঠে। কিছু কিছু ফেরকা রুহুল কুদসের স্থলে হযরত মারয়াম আলাইহাস সালামকে তৃতীয় সত্তা মনে করে।

২. মাসিহের ঈশ্বরপুত্র হওয়ার বিশ্বাস

খ্রিস্টানদের বিশ্বাস হলো, মাসিহ ঈশ্বরপুত্র। এর পাশাপাশি তিনি নিজেও ঈশ্বর। অর্থাৎ ঈসা ঈশ্বরপুত্রও বটে, ঈশ্বরও বটে। তিনি কিছু সময়ের জন্যে ঈশ্বরপুত্রের রূপ ধারণ করে মানুষ বেশে আগমন করেন। এরপর পুনরায় তিনি ঈশ্বরের অবয়বে ফিরে যান। এখন তিনি স্বতন্ত্রভাবে যুগপৎ মানুষ ও ঈশ্বর।

৩. ইনকারনেশন বিশ্বাস

এর ব্যাখ্যা হলো, ঈশ্বরের বাকবৈশিষ্ট্য মানবজাতির কল্যাণের জন্যে মহান মাসিহের মানবদেহে প্রবিষ্ট হয়েছিল।

৪. ঈসা মাসিহের ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার বিশ্বাস

তাদের বিশ্বাস হলো, ঈশ্বরপুত্র 'ক্রাইস্ট'-কে ইহুদিরা গভর্নর পন্টিয়াস পিলাত (Pontius Pilate) এর নির্দেশে শূলিতে চড়িয়ে হত্যা করা হয়েছিল।

৫. (Resurrection) বা পুনর্জন্মে বিশ্বাস

তারা বিশ্বাস করে, শূলিতে ঝুলিয়ে হত্যা করার পর তাকে কবরে সমাহিত করা হয়। সমাহিত করার তিন দিন পর যিশু পুনরায় জীবিত হয়ে আসমানে চলে যান। সেখানে তিনি ঈশ্বরের ডান দিকে বসে আছেন। মহাপ্রলয়ের কাছাকাছি সময়ে তিনি পুনরায় দেখা দেবেন।

৬. (atonement/Redemption) প্রায়শ্চিত্তে বিশ্বাস

প্রায়শ্চিত্ত সংক্রান্ত বিশ্বাসের দার্শনিক বিশ্লেষণ হলো, যখন আদম আলাইহিস সালাম গন্দমদানা খান তখন তার থেকে আসল পাপ (the

originalsin) প্রকাশ পায়। এর ফলে একদিকে মানবজাতির মাঝে ঈশ্বরের অবাধ্যতার উপাদান সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে পুণ্যের ইচ্ছাশক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। এটা এতোটাই মারাত্মক অপরাধ যে, এর কারণে সকল মানুষ ঈশ্বরের বিচারে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হওয়ার যোগ্য। কিন্তু ঈশ্বর তার বান্দাদের দণ্ডিত না করে খোদ নিজেই সন্তানের অবয়ব ধারণ করে পৃথিবীতে আবির্ভূত হন এবং ওই শাস্তি নিজের ওপর বরণ করে নেন। কাজেই যে ব্যক্তি যিশুকে ঈশ্বরপুত্র বিশ্বাস করবে এবং তার এই অবদানের ওপর আস্থা রাখবে, সে ব্যক্তি এই বিশ্বাসের কল্যাণে জন্মগত পাপ থেকে নিষ্কৃতি পাবে। [নাউযুবিল্লাহ]

অধিকাংশ মানুষ নিজের ধর্ম ছেড়ে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে, এই প্রায়শ্চিত্তের বিশ্বাসে প্রভাবিত হয়ে। সবাই প্রত্যাশা করে, তার জন্মগত পাপের বিনাশ হোক।

খ্রিস্টবাদের মূল উৎস

খ্রিস্টানদের ধর্মগ্রন্থের নাম বাইবেল। যার দুটি অংশ। অল্ড টেস্টাম্যান্ট। নিউ টেস্টাম্যান্ট।

দ্যা অল্ড টেস্টাম্যান্ট

অল্ল টেস্টাম্যান্টের মাঝে রয়েছে তাওরাত, যবুর ও সেগুলোর আনুষঙ্গিক আলোচনা। তারা স্রেফ বারাকাতের জন্যে এগুলো বহন করে। কখনই এর ওপর আমল করে না।

দ্যা নিউ টেস্টাম্যান্ট

নিউ টেস্টামেন্ট বা ইঞ্জিল হলো খ্রিস্টধর্মের মূল উৎস। খ্রিস্টানদের হাতে বর্তমানে ইঞ্জিলের যে কপিটি রয়েছে, তা মূলত ঈসা আলাইহিস সালামকে আকাশে উঠিয়ে নেওয়ার ৩২৫ বছর পর পাদরিদের প্রসিদ্ধ সম্মেলন 'মিকাভি কাউন্সিল'-এ নির্বাচিত হয়। অথচ এ কপিটির আসল ইঞ্জিল হওয়ার পক্ষে কোনো গ্রহণযোগ্য প্রমাণ নেই। নিউ টেস্টামেন্ট হচ্ছে ২৭ টি বইয়ের সমন্বিত সংকলন। এগুলোর মধ্য হতে চারটিকে

মৌলিক গ্রন্থের মর্যাদা দেওয়া হয়। একবাক্যে এগুলোকে أناجيل أربعة [আনাজিলে আরবা'আহ] বলা হয়। এগুলোর নাম, মথি সমাচার, মার্ক সমাচার (Gospel of Mark), লূকা সমাচার ও ইউহান্না সমাচার।

বর্তমানে সহজলভ্য চারটি ইঞ্জিলের মূল্যায়ন

আলোচিত চারটি সমাচার-সহ বাইবেলের মাঝে যতগুলো ইঞ্জিল রয়েছে, এগুলোর কোনোটার পক্ষেই এমন কোনো প্রমাণ নেই, যা দিয়ে সেগুলোকে আল্লাহর বাণী, বা হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের ওপর অবতীর্ণ ইঞ্জিল প্রমাণিত করা যাবে। আমাদের নিকট অতীতের কয়েকজন খ্রিস্টান গবেষক দীর্ঘ গবেষণার পর এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, বাইবেল ও ইঞ্জিল আল্লাহর বাণী নয়; বরং এগুলো হলো, হাওয়ারি তথা ঈসা আলাইহিস সালামের সহচরদের রচনা। তারা যিশুর সঙ্গে তাদের সাক্ষাতের বিবরণ এ রচনাগুলোতে তুলে ধরেছেন। ইনসাইক্লোপিডিয়া বৃটানিকায় এসেছে,

> 'পবিত্র গ্রন্থগুলোর প্রতিটি কথা কি ঈশ্বরের, না অন্য কারো— এটি একটি বিতর্কিত বিষয়।' [খণ্ড- ১১, পৃষ্ঠা-২৪৭]

খ্রিস্টধর্মের উপাসনা ও প্রথা

খ্রিস্টানদের উপাসনার মূলনীতি হলো, চার্চে গিয়ে সম্মিলিতভাবে উপাসনা করা। সবচেয়ে বিখ্যাত উপাসনা হলো, প্রশংসাগীত। যা পালন করার জন্যে সকাল-সন্ধ্যা চার্চে সমবেত হয়। এ অনুষ্ঠানে বাইবেল থেকে যবুরের গীত পাঠ করা হয়।

যখন কোনো ব্যক্তি খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে তখন তার থেকে খ্রিস্টধর্মের বিশ্বাসের স্বীকারোক্তি নেওয়ার পর তার শরীরে একটি বিশেষ ধরনের তেল ম্যাসেজ করা হয় এবং একটি নতুন পোশাক পরিয়ে দেওয়া হয়। যার ব্যাখ্যা হলো, পুরাতন পোশাক খুলে ফেলার মাধ্যমে সে জন্মগত পাপ থেকে পবিত্র হলো। এই কাজটিকে 'ব্যাপ্টিজম' বলা হয়।

প্রতি রোববার চার্চে প্রার্থনা ও প্রশংসাসভা আয়োজিত হয়। এরপর মদ ও রুটি সামনে রেখে চার্চের পাদরি ঈশ্বর, সন্তান ও পবিত্র আত্মার কাছে

বরকত লাভের দুআ করেন। উপস্থিত লোকদের মাঝে রুটি ও মদ বিতরণ করা হয়। খ্রিস্টানদের বিশ্বাস হলো, রুটি মাসিহের শরীর আর মদ তার রক্তে পরিণত হয়।

প্রতিবছর ৩ মে 'ক্রুশ পুনরুদ্ধার উৎসব' পালন করে। ২৫ ডিসেম্বর মাসিহের জন্মোৎসব ক্রিসমাস, ২২ থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত হযরত মাসিহের পুনরুজ্জীবনের আনন্দোৎসব ইস্টার, আর ইস্টারের পূর্বে সমাগত শুক্রবার মাসিহকে শূলিবিদ্ধ করার উৎসব 'গুড ফ্রাইডে' পালন করা হয়।

বিদ্যমান খ্রিস্টধর্মের ভিত্তি

আমরা খ্রিস্টধর্মের যেই রূপ বর্তমানে দেখতে পাচ্ছি, এটি মূলত সেন্ট পলের তৈরি। তার পরিচয় হচ্ছে, সে ঈসা আলাইহিস সালামের শিষ্যদের শিষ্য। ব্যক্তিজীবনে এই সেন্ট পল কখনই হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম বা তার কোনো শিষ্যের সংশ্রব পায়নি। সে বরং খ্রিস্টধর্মের ঘোরতর শত্রু ছিল। কিন্তু পরবর্তী জীবনে এ ধর্মের ওপর বিশ্বাস আনার কথা প্রকাশ করে খ্রিস্টধর্মের প্রচারকাজে নেমে পড়ে। মূলত সে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের আসমানি শিক্ষা বিকৃত করার জন্যে ঈসায়ি পাদরির রূপ ধারণ করেছিল। কেউ যদি গভীর মনোযোগের সঙ্গে বিশ্লেষণ করে তাহলে খুব সহজেই বুঝতে পারবে যে, বিদ্যমান ইঞ্জিলের নিউ টেস্ট্যামেন্ট থেকেও এ কথা প্রমাণিত হয় যে, পোলের শিক্ষা আর হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের শিক্ষা এক নয়। যেমন,

* ঈসা আলাইহিস সালাম একত্ববাদের শিক্ষা দিয়েছিলেন। মার্ক সমাচারের ১২ নম্বর অধ্যায়ের ২৯ নম্বর ধারায় আছে, 'আমাদের প্রভু একজন।' অথচ এর বিপরীতে পোল ত্রিত্ববাদের দর্শন পেশ করেছে।
* নিউ টেস্টাম্যান্টের ৬০ এরও অধিক স্থানে ঈসা আলাইহিস সালাম নিজেকে আদমসন্তান অভিহিত করেছেন। কিন্তু পোল মাসিহের দেহে প্রভুর মিশে যাওয়ার বিশ্বাস পেশ করেছে এবং তাঁকে প্রভুপুত্র দাবি করেছে। তার বক্তব্য হলো,

'প্রভুত্বের সকল ক্ষমতা তাঁর মাঝে প্রবিষ্ট হয়ে স্থির আছে।'

* হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম তাওরাত গ্রন্থের সত্যায়ন করতেন। বাইবেলের মাঝে তার এ বাণী বিধৃত রয়েছে যে, 'এ কথা মনে করো না যে, আমি তাওরাত রহিত করতে এসেছি। আমি রহিত করতে আসিনি; বরং পূর্ণতা দিতে এসেছি।' [মথি সমাচার, অধ্যায়- ৫, ধারা-১৭]

  কিন্তু পোল তাওরাতকে অস্বীকার করে বলে, 'মাসিহ আমাদের দিকে তাকিয়ে অভিশাপ বরণ করে নিয়েছেন। তিনি আমাদের দায়িত্ব বহন করে আমাদেরকে শরিয়তের অভিশাপ থেকে নিষ্কৃতি দিয়েছেন।

  বাইবেলে যেখানে 'দ্যা ল' শব্দ এসেছে, সেখানে এ শব্দ দ্বারা একটাই উদ্দেশ্য, তাওরাত।
* বড় বড় হাওয়ারি, অর্থাৎ ঈসা আলাইহিস সালামের শীর্ষস্থানীয় সহচর যেমন, ইউহান্না, পিটার্স, বারনাবাস প্রমুখ পোলের এই মতবাদের বিরুদ্ধে। যা প্রমাণিত করে যে, পোল মূলত মানুষকে ইঞ্জিলের নাম ব্যবহার করে পথচ্যুত করেছিল।

খ্রিস্টধর্মের ইতিহাস

খ্রিস্টধর্মের ইতিহাস বনি ইসরাইলের ইতিহাসের সঙ্গে বেশ সম্পৃক্ত। হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের জন্মের পূর্বে বনি ইসরাইল অনেকগুলো ধর্মীয় ফেরকায় বিভক্ত হয়ে পড়েছিল।

হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম জন্মগ্রহণ করেছিলেন বাইতুল মাকদিসের কাছাকাছি বেথেলহাম (বাইতুল লাহম) জনপদে। তাঁর মা মারয়াম বিনতে ইমরান আলাইহিস সালাম ছিলেন সতী-সাধ্বী কুমারী নারী। তাঁর গর্ভে তিনি আল্লাহর মু'জিযা (বিস্ময়কর নিদর্শন) হিসেবে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি যখন দুধের শিশু, তখনই তিনি মানুষের সঙ্গে কথা বলে বিস্ময় সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি তাদের তখনই জানিয়েছিলেন, আল্লাহ আমাকে কিতাব দান করবেন এবং নবুওয়াতে ভূষিত করবেন।

হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম এসেছিলেন ইহুদিদের সংশোধনের মিশন নিয়ে। কিন্তু ইহুদিরা তার ওপর খুব একটা ঈমান আনেনি। তারা তখন

দু' দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একদলের বক্তব্য ছিল, তাওরাত ছাড়া অন্য কোনো গ্রন্থ গ্রহণযোগ্য নয়। তারা ইঞ্জিল প্রত্যাখ্যান করে। এদেরকেই ইহুদি বলা হয়। এর বিপরীতে যে দলটি তার কথার ওপর ঈমান গ্রহণ করে তাদেরকে 'নাসারা' বলা হয়। ইহুদিরা হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের ধর্মপ্রচারের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে এবং তাকে হত্যার ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠে। হযরত জিবরিল আলাইহিস সালাম হাওয়ারিদের চোখের সামনে তাঁকে আসমানে তুলে নেন। ওদিকে আল্লাহর নির্দেশে ইহুদি গোষ্ঠী কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত গুপ্তচরের চেহারা হুবহু ঈসা আলাইহিস সালামের চেহারার অনুরূপ হয়ে যায়। ইহুদিরা চেহারার সাদৃশ্যে বিভ্রান্ত হয়ে তাকেই শূলিতে ঝুলিয়ে দেয়। পরবর্তীকালে যখন পোল নতুন লোকদের মাঝে খ্রিস্টধর্মের প্রচার শুরু করে তখন সেও ইহুদিদের বিশ্বাস অনুকরণ করে জনগণের মাঝে এ কথা ছড়িয়ে দেয় যে, ঈসা আলাইহিস সালামকে শূলিবিদ্ধ করে হত্যা করা হয়েছিল।

খ্রিস্টধর্মের ইতিহাসের তিন যুগ

প্রথম যুগ : ধর্মপ্রচার ও পরীক্ষা

এই যুগ ঈসায়ি প্রথম শতাব্দী থেকে শুরু হয়ে তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তৃত। এ যুগে সেন্ট পল তাওরাতের সমস্ত বিধি-বিধান পরিত্যাজ্য ঘোষণা করে খ্রিস্টধর্মের নতুন রূপরেখা প্রণয়ন করে। ওই যুগের অধিকাংশ মানুষ তার ষড়যন্ত্রের জালে ফেঁসে যায়। ইতিহাসের এই সময়টিকে 'পরীক্ষার যুগ' বলা হয়। কারণ, এ যুগে নিজস্ব বিশ্বাস প্রচার করার কারণে খ্রিস্টানরা রোমানদের প্রচুর নির্যাতন-নিপীড়নের ধকল পোহায়। রোমানসমাজে অন্য কোনো ধর্ম প্রচারের অনুমতি ছিল না। ওই যুগে যারা হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের ওপর সত্যিকারের ঈমান এনেছিল, তারা ধীরে ধীরে নিঃশেষ হয়ে যায়, বা সমাজ ছেড়ে নির্জন অঞ্চলে গিয়ে জীবন কাটিয়ে দেয়।

দ্বিতীয় যুগ : কাউন্সিলের যুগ (Age of Councils)

ঈসায়ি চতুর্থ শতাব্দীকে বলা হয় 'কাউন্সিলের যুগ'। এ যুগে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের প্রভাব রোমসম্রাটের রাজদরবার অবধি পৌঁছে যায়। রোমসম্রাট 'কনস্ট্যান্টিনোপল' খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে। ওই যুগে খ্রিস্টান পণ্ডিত ও পাদরিরা সম্মিলিতভাবে সমাবেশ করে বাইবেল সংকলন ও ধর্মীয় প্রথা-রেওয়াজের ব্যাপারে আলোচনা, যুক্তি-তর্ক করতো। এভাবে তারা আলোচনা-বিশ্লেষণ করে খ্রিস্টধর্মের নিয়ম-নীতি নির্ধারণ করে। তাদের সেই বৈঠককে 'কাউন্সিল' (Counsils) বলা হতো।

কাউন্সিলের যুগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, ৩২৫ ঈসাব্দে 'নিকিয়া' (Nicaea) নগরীতে অনুষ্ঠিত 'নিকাভি কাউন্সিল'। সেখানে ত্রিত্ববাদকে ধর্মের বিশেষ অনুষঙ্গের মর্যাদা দেওয়া হয়।

তৃতীয় যুগ : বিস্তৃতি ও প্রসারের যুগ

পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে খ্রিস্টধর্ম ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করে। ওই যুগে বাজেন্টাইন রোম সাম্রাজ্য এশিয়া ও ইউরোপ— দু' অংশে বিভক্ত হয়ে যায়। পূর্বাঞ্চলের রাজধানী হয় কনস্ট্যান্টিনোপল। আর পূর্বাঞ্চলের রাজধানী নির্ধারিত হয় রোম। পাশাপাশি চার্চও দু' ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। কনস্ট্যান্টিনোপলের চার্চের নামকরণ হয় 'অর্থোডিক্স চার্চ'। এর প্রধানকে বলা হতো 'প্যাট্রিক' (Patrick)। আর রোমের চার্চকে বলা হতো 'ক্যাথলিক চার্চ'। এর প্রধানকে বলা হতো 'পোপ'। এ যুগেই সন্ন্যাসবাদের জন্ম হয়। অনেক খ্রিস্টান পৃথিবী থেকে সম্পর্কচ্ছেদ করে বন-বাদাড়ে নিবাস পাততে শুরু করে।

প্রথম যুগ

প্রথম অন্ধকার যুগ (Period of darkness: 1)

খ্রিস্টধর্মের ইতিহাসে ৫৯০ ঈসাব্দ থেকে ৮০০ ঈসাব্দ ব্যাপী সময়কালকে 'প্রথম যুগ' বলা হয়। এই যুগকে অন্ধকার যুগ বলার কারণ হলো, ওই সময় ইসলামধর্মের উত্থানের কারণে খ্রিস্টধর্ম পুরো এশিয়া-আফ্রিকা থেকে সরে পড়তে বাধ্য হয়।

মধ্যযুগ

দ্বিতীয় অন্ধকার যুগ (Period of darkness: 2)

এ যুগটির ব্যাপ্তি ৮০০ ঈ. (১৮৪ হি.) থেকে ১৫২১ ঈ. (৯২৮ হি.) পর্যন্ত। এ যুগে পোপের অসীম ক্ষমতা সম্রাটদেরকে পোপের প্রতিপক্ষ বানিয়ে তোলে। শুরু হয়ে ধর্মের সঙ্গে রাজনীতির সংঘাত। যা প্রায় সাতশ বছর চলমান থাকে। পাদরিদের উন্মাদনার কারণেই এই যুগে ক্রুসেডীয় যুদ্ধগুলো সংঘটিত হয়েছিল। পাদরিদের এ ধরনের কর্মকাণ্ডে ক্ষুব্ধ হয়ে ইউরোপিয়ান শাসক ও নেতৃবর্গ জনগণের মনে চার্চের প্রতি ক্ষোভ ছড়িয়ে দেয়। শুরু হয় শাসক কর্তৃক পোপের ক্ষমতা হ্রাস করার তোড়জোড়।

ইয়ান হুইস ও জেরোমের শুদ্ধি আন্দোলন

ওই যুগে কয়েকজন খ্রিস্টান পাদরি বিপর্যয় কাটিয়ে উঠে, ধর্মকে নতুন নিয়মের ওপর গড়ে তোলার কথা ভাবতে শুরু করে। এদের মধ্যে রয়েছেন, জন ওয়াইক্লিফ, ইয়ান হুইস ও জেরোমের নাম উল্লেখযোগ্য। জন ওয়াইক্লিফ সর্বপ্রথম ল্যাটিন ভাষা থেকে বাইবেল ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করেন। ইয়ান হুইস ও জেরোমে— এ দুজনও ক্যাথলিক চার্চের অনেকগুলো মূলনীতি অস্বীকার করে নতুন শিক্ষা উপস্থাপন করেন। কিন্তু তাদের সেই প্রচেষ্টা তাদের জীবদ্দশায় সফলতার মুখ দেখেনি।

রিফরমেশন (Reformation) বা ধর্মের শুদ্ধি আন্দোলন

ধর্মের সংস্কার আন্দোলনের সবচেয়ে বড় নেতার নাম, মার্টিন লুথার। তাকে প্রটেস্ট্যান্ট ধর্মের প্রবর্তক মনে করা হয়। সেই সর্বপ্রথম প্রথাগত ধর্মীয় বিশ্বাসগুলোর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু করে, ধর্মের শুদ্ধি অভিযানের সূচনা করে। তার সেই শুদ্ধি আন্দোলনকে রিফরমেশন বলা হয়। যার শাব্দিক অর্থ, সংস্কার।

লুথার পাদরিদের পক্ষ থেকে ক্ষমার সার্টিফিকেট বিক্রয়ের সমালোচনা করে বলে, ক্ষমা করার অধিকার এককভাবে প্রভুর। তিনি জনগণকে এ অধিকার দিয়েছেন যে, তারা নিজেরাই বাইবেল পড়ে বুঝতে পারবে। এ সকল পাদরির ব্যাখ্যার কোনো প্রয়োজন নেই। লুথারের সমর্থকদের সংখ্যা আশঙ্কাজনক হারে বৃদ্ধি পেতে দেখে ১৫২৯ ঈসাব্দে পোপ পরাজয় মেনে নেয়। তখন এ সিদ্ধান্ত হয় যে, প্রত্যেক শাসক তার রাজ্যে নিজের পসন্দসই ধর্ম প্রচার করতে পারবে। এ ঘটনার পর ইউরোপে 'রোমান চার্চের' বিপরীতে 'প্রটেস্ট্যান্ট চার্চ'ও প্রতিষ্ঠিত হয়।

যুক্তিবাদের যুগ

মার্টিন লুথার সর্বপ্রথম বাইবেলের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের কাজে নিজের পূর্ববর্তীদের বিরুদ্ধে মতনৈক্যের দুঃসাহস প্রদর্শন করেছিল। তার এই পদক্ষেপ যদিও বাহ্যিকভাবে একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ; কিন্তু এর মাধ্যমে সে বাইবেল পড়া ও বোঝার অধিকার জনগণের হাতে তুলে

দিয়ে মুক্তচিন্তা ও অবাধ স্বাধীনতার দুয়ার খুলে দেয়। কেননা, এর মাধ্যমে কোনটা বৈধ আর কোনটা অবৈধ— সেটা নির্ধারণ করার অধিকার জ্ঞানীদের হাত থেকে সাধারণ জনগণের হাতে চলে যায়। এর ফলে ধর্মীয় জ্ঞানের ওপর বুদ্ধি ও যুক্তি প্রাধান্য লাভ করে। শুরু হয় মুক্তবুদ্ধিচর্চার নতুন যুগ। যা মূলত ধর্মহীনতার পথ সুগম করে।

উইলিয়াম ওয়ার্থ, লর্ড হার্বার্ট, ভলতেয়ার (Voltaire) এর মতো মুক্তচিন্তার বুদ্ধিজীবিরা সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে মুক্তবুদ্ধিচর্চাকে ইউরোপের সবচেয়ে জনপ্রিয় দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে ছড়িয়ে দেয়। যার ফলে ধর্ম পেছনে সরে আসতে বাধ্য হয়।

মর্ডানিজম (Modernism) বা আধুনিকায়নের যুগ

'মুক্তবুদ্ধি'র বিভিন্ন ক্ষতিকর দিক পর্যবেক্ষণ করে কিছু বুদ্ধিজীবি একটি মধ্যপন্থার পথ আবিস্কার করে। তারা ধর্মকে প্রত্যাখ্যান না করে বরং সেটির আধুনিকায়নের ওপর মনোনিবেশ করে। তাদের অভিমত হলো, বাইবেল ছুড়ে না ফেলে, সেটিকে আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে পাঠ করা হোক। বাইবেলের শিক্ষাকে আধুনিক যুগচাহিদার কাঠামোতে সাজিয়ে জনগণের সামনে পেশ করা হোক।

কাউন্টার রিফরমেশন (Counter Reformation) বা জবাবি আন্দোলন

ক্যাথলিক চার্চের শেকড় ক্রমান্বয়ে দুর্বল হতে দেখে পোপ চতুর্থ পল রিফরমেশন আন্দোলনের জবাবে, ক্যাথলিক চার্চের সংস্কার ও নতুন ব্যবস্থাপনায় ঢেলে সাজানোর আন্দোলন শুরু করেন। তার এই প্রয়াসকে নাম দেওয়া হয় 'জবাবি আন্দোলন'।

যিসুস আন্দোলন

স্পেনের একটি চরমপন্থী দল 'অর্গানাইজেশন লায়লা' ক্যাথলিক চার্চের সেবায় কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করার তীব্র আবেগ লালন করতো। এই আবেগ থেকে তারা কয়েকজন সমমনা সঙ্গীকে নিয়ে ১৫৩৪ ঈসাব্দে

'যিসুস দল' গঠন করে। এদের লক্ষ্য হলো, দুনিয়ার প্রতি নির্মোহ মনোভাব, দারিদ্র প্রকাশের পাশাপাশি খ্রিস্টধর্মের শিক্ষা প্রচার করা। এখান থেকেই শুরু হয় 'খ্রিস্টধর্মে ধর্মান্তরের কার্যক্রম'।

ধর্ম পুনঃপ্রবর্তনের আন্দোলন

মুক্তিবুদ্ধিচর্চা ও আধুনিকায়নের বিভিন্ন আন্দোলনের উল্টো প্রতিক্রিয়া হিসেবে উনবিংশ শতাব্দীতে বেশ কয়েকজন পাদরি খালেস প্রাচীন ধর্মীয় বিশ্বাস ও মূল্যবোধের সমর্থন শুরু করে। তাদের উদ্যোগে শুরু হয় 'প্রাচীন ধর্মের পুনরুজ্জীবন কার্যক্রম'।

একবিংশ শতাব্দীতে ক্রিশ্চিয়ান গির্জা

বর্তমান সময়ে খ্রিস্টসমাজে মুক্তবুদ্ধিপ্রেমী, আধুনিকায়নকামী ও সেকেলে মনোভাবাপন্ন— অর্থাৎ তিন ধরনের লোক মাঠে-ময়দানে কর্মরত রয়েছে। তারা নিজেদের বলয় প্রসারিত করার কাজ বেশ জোরে-শোরে চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, এই তিন দলের সবকটি মূল সত্য থেকে শত ক্রোশ দূরে পড়ে রয়েছে। সত্যের দেখা তারা তখনই পাবে, যখন তারা ইসলামের দুয়ারে এসে কড়া নাড়বে। কেননা ইসলামই পৃথিবীর একমাত্র সত্য ধর্ম।

প্রচলিত বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি

বস্তুবাদি দর্শনের আক্রমণ

ফিলোসফি খ্রিস্টধর্মের সঙ্গে জোট বেঁধে বর্তমান যুগের অধিকাংশ চৈন্তিক গুমরাহি সৃষ্টি করেছে। কাজেই গ্রিকদর্শনকে সমালোচনার চোখে গভীর পর্যবেক্ষণ ও অধ্যয়ন করা খুবই জরুরি।

ফিলোসফি (Philosophy) এর সংজ্ঞা

ফিলোসফির শাব্দিক অর্থ— 'প্রজ্ঞার প্রতি ভালোবাসা লালন করা।'

পারিভাষিক সংজ্ঞা হলো— 'ফিলোসফি এমন এক জ্ঞান, যার মাধ্যমে বস্তুর প্রকৃত অবস্থা জানা যায়।'

ফিলোসফির লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হলো, বিশ্বাস, নৈতিকতা, নাগরিক জীবন, রাজনীতি ও প্রাকৃতিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে মানুষকে পথ দেখানো। ফিলোসফির পূর্ণ নির্ভরতা বুদ্ধির ওপর। এই শাস্ত্র কখনই আসমানি জ্ঞানের সহায়তা গ্রহণের প্রয়োজন অনুভব করে না। এমন নয় যে, ফিলোসফি শুধু ভালো-মন্দের মাণদণ্ড নিজেই নির্ধারণ করে; বরং অতিপ্রাকৃতিক বা প্রকৃতির ঊর্ধ্বের বিষয়গুলোতেও সে নিজেই সঠিক-বেঠিকের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

ফিলোসফির ইতিহাস

সূচনা থেকে আজ অবধি ফিলোসফি সাতটি যুগ অতিক্রম করে এসেছে। বর্তমানে অষ্টম যুগ চলছে।

১. গ্রিক যুগ : খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দী।
২. রোমান যুগ : ঈসায়ি প্রথম শতাব্দী থেকে পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত।
৩. মধ্যযুগ বা ঈসায়ি যুগ (ঈসায়ি পঞ্চম শতাব্দী থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত।

৪. জ্ঞানের পুনরুজ্জীবন আন্দোলন। ধর্মের সংস্কার আন্দোলন (প্রটেস্ট্যান্ট ধর্ম) ঈসায়ি পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়কাল।
৫. নিরেট যুক্তিবাদের যুগ : সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর পরিসমাপ্তি পর্যন্ত।
৬. শিল্পবিপ্লবের যুগ : ১৮০১ ঈসাব্দ থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তি পর্যন্ত।
৭. দ্বিচারিতা ও মিথ্যা ধর্মের আত্মপ্রকাশের যুগ : প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তি থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত।
৮. ইসলামি জাহানের পুনরুজ্জীবনের পূর্বাভাস ও একবিংশ শতাব্দী।

১. গ্রিক যুগ

গ্রিকদেশকে মনে করা হয় ফিলোসফির আঁতুড়ঘর। প্রাচীন যুগে এখানকার মানুষদের মন-মস্তিষ্কে দেব-দেবীর রামরাজত্ব ছিল। যিশুপূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে এখানে এমন কিছু দার্শনিক জন্মগ্রহণ করেন, যাদের হাত ধরে গ্রিকদর্শনের অভ্যুদয় ঘটে। তাদেরকেই حكماء متقدمين [প্রাচীন দার্শনিক] বলা হয়। এদের মধ্যে রয়েছেন, পিথাগোরাস (Pythagoras)[২] (মৃত্যু : খ্রিস্টপূর্ব ৪৩৬) ও তার শিষ্য হিপোক্রেটিস (Hippocrates)[৩] (জন্ম : খ্রিস্টপূর্ব ৩৫৯ – মৃত্যু : খ্রিস্টপূর্ব ৪৬৯) সবচেয়ে বেশি প্রসিদ্ধ।

---

২. সামোসের পিথাগোরাস ছিলেন একজন আয়োনীয় গ্রিক দার্শনিক, গণিতবিদ এবং পিথাগোরাসবাদী ভ্রাতৃত্বের জনক। যার প্রকৃতি ধর্মীয় হলেও তা এমন সব নীতির উদ্ভব ঘটিয়েছিল, যা পরবর্তীতে প্লেটো ও এরিস্টটলের মত দার্শনিকদের প্রভাবিত করেছে। তার জন্মস্থান : Samos, গ্রিস। মৃত্যুস্থল : Metapontum। সম্পূর্ণ নাম : Pythagoras of Samos। সন্তান : Arignote, Myia, Telauges, Damo। পিতামাতা : Mnesarchus, Pythais। ভাইবোন : Eunomus, Themistocleia, Tyrrhenus। —অনুবাদক

৩. কসের হিপোক্রেটিস, যিনি দ্বিতীয় হিপোক্রেটিস নামেও পরিচিত। পেরিক্লেসের যুগের একজন প্রাচীন গ্রিক চিকিৎসক ছিলেন। যাঁকে চিকিৎসাশাস্ত্রের ইতিহাসে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিদের মধ্যে একজন বলে গণ্য করা হয়।

জন্ম তারিখ : ৪৬০ খ্রিস্টপূর্ব। জন্মস্থান : কস, গ্রিস। মরার তারিখ এবং স্থান: ৩৭০ খ্রিস্টপূর্ব, লারিসা, গ্রিস। সন্তানের নাম : Thessalus, Draco। পিতামাতা : হেরাক্লাইডস, Praxitela। —অনুবাদক

খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে ফিলোসফি এতোটাই প্রভাব বিস্তার করে যে, তখন দেব-দেবীর আচ্ছন্নতার প্রভাব খুবই হ্রাস পেয়ে যায়। ওই যুগের দার্শনিকদের বলা হতো, حكماء متأخرين। এ সময়টিকে গ্রিক দর্শনের উত্থানযুগ বলা হয়। সক্রেটিস (Socrates), ইরিস্টটল (Aristotle) ও প্লেটো (Plato) হচ্ছেন এ যুগের বিখ্যাত দার্শনিক। এদেরকে ভ্রাম্যমাণ দার্শনিকও বলা হতো। কেননা তারা হাঁটতে হাঁটতে দর্শনের পাঠ দিতেন। ফিলোসফিস্টদের আরেকটি দলের নাম 'ইশরাকি গোষ্ঠী' (Illuminationist)। এদের সম্পর্ক ছিল আলেকজান্দ্রিয়ার সঙ্গে। তারা ধ্যান ও নিভৃত সাধনায় অভ্যস্ত ছিল। দার্শনিকদের তৃতীয় আরেকটি দলের নাম 'সফিস্ট' (Sophist)[৪]। এর বস্তুর মৌলিকত্বকে অস্বীকার করতো। এদের দৃষ্টিভঙ্গির পুরোটাই ছিল ভ্রমের ওপর।

ফিলোসফিস্টদের বিভ্রান্তি ও পথচ্যুতি

'আসমানি শিক্ষা' থেকে বঞ্চিত থাকার কারণে গ্রিক দার্শনিকরা বিভ্রান্তির অতল গহ্বরে পড়ে যায়। তারা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে এতোটাই অজ্ঞ ছিল যে, কখনই একত্ববাদ সম্পর্কে জানতে পারেনি। আল্লাহর বিভিন্ন বিশেষণ ও পবিত্রতা সম্পর্কে পুরোপুরি অজ্ঞ ছিল। তারা বস্তুকে আদি ও অনন্ত মনে করত। তারা বিভিন্ন দেব-দেবীদের মাধ্যমে عقول عشرة এর ধারণা লাভ করে। তারা মনে করত, এরাই প্রকৃত স্রষ্টা।

---

[৪]. আরবিতে এদেরকে سوفسطائية বলা হয়। শরহে আকাইদ গ্রন্থের শুরুতে এদের সংক্ষিপ্ত আলোচনা রয়েছে। সফিস্ট (ইংরেজি: Sophists) উৎসারিত হয়েছে গ্রীক শব্দ sophós থেকে, যার অর্থ জ্ঞানী মানুষ। প্রাকসক্রেটিস যুগের প্রভাবশালী দার্শনিক সম্প্রদায়। প্রোতাগোরাস, প্রডিকাস, হিপ্পিয়াস, জর্জিয়াস প্রমুখ ছিলেন এদের অন্তর্ভুক্ত। খ্রিস্টপূর্ব ৫ম শতকের শেষদিকে এরা জনপ্রিয়তা লাভ করলেও পরবর্তীকালে সক্রেটিস ও প্লেটো কর্তৃক এদের চিন্তা-দর্শন ব্যাপকভাবে সমালোচিত হয়। সফিস্টগণ ছিলেন পেশাদার শিক্ষক। তারা বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে শিক্ষাদান করতেন। সফিস্টরা কোন সুসংহত দার্শনিক চিন্তার অধিকারী না হলেও তৎকালিন প্রচলিত মতবাদের সমালোচনা ও অসংগতিসমূহ আলোচনার মাধ্যমে জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন। —অনুবাদক

ফিলোসফিস্টরা যেই জীবনদর্শন গ্রহণ করে, তার সকল কার্যক্রম এই নশ্বর জগতকে কেন্দ্র করে। তারা কখনই এ কথা ভাবতো না যে, আমরা কীভাবে ও কোন উদ্দেশ্যে সৃজিত হয়েছি? কে আমাদের সৃষ্টি করেছেন? আমরা কোন জায়গা থেকে এসেছি এবং কোথায় যাব?

যেহেতু তারা জন্মস্থল ও প্রত্যাবর্তনস্থল সম্পর্কে অজ্ঞ ছিল এবং তাদের মনোযোগের পুরোটা ছিল মানবসমাজকে কেন্দ্র করে, এজন্যে এখান থেকে তাদের মাঝে মানবধর্ম কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি জন্ম নিতে শুরু করে। তারা প্রতিটি বিষয়কে শুধু মানুষের পার্থিব স্বার্থের দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করতো। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পরবর্তীকালে পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে 'হিউম্যানিজম' (Humanism) বা 'মানবধর্ম'-এর আন্দোলন শুরু হয়।

নৈতিকতার ক্ষেত্রে সুন্দর বচন, সুন্দর আচরণ, সাহিত্য, সভ্যতা ও পরিমার্জিত অবয়ব অবলম্বন করাকেই তারা জীবনের শ্রেষ্ঠত্ব ও বেঁচে থাকার সার্থকতা মনে করতো। হিংসা, অহংকার, দ্বিচারিতা, দুনিয়ার লোভ, সম্পদের লোভ, সামাজিক সম্মানের লোভ— অর্থাৎ অন্তর্জগতের রোগ-ব্যাধি সম্পর্কে তারা পুরোপুরি অজ্ঞ ছিল। গ্রিকসমাজের চিন্তা-ভাবনার মূল প্রতিপাদ্য ছিল, ন্যায় ও সততা, সৌন্দর্য ও সৌকর্যসহ সব ধরনের সদ্গুণের ওপর প্রতিষ্ঠিত সমাজ প্রতিষ্ঠার একমাত্র মাধ্যম হলো মানববুদ্ধির সঠিক পরিচালনা ও এর সদ্ব্যবহার। যার কারণে সেই সমাজে উলঙ্গ শরীরকে শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য জ্ঞান করা হতো। ওই যুগে নগ্নতা ও নির্লজ্জতার রমরমা অবস্থা ছিল।

২. রোমান যুগ

ফিলোসফির দ্বিতীয় যুগ শুরু হয়, যখন রোমানরা ইউরোপের সবচেয়ে বড় শক্তি হয়ে আবির্ভূত হয় এবং গ্রিক এশিয়ার যেই অঞ্চলগুলো দখল করে রেখেছিল, সেগুলোর ওপর রোমানরা দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়। ওই সময়কালটি হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের জন্মের ৬৪ বছর পূর্ব থেকে শুরু হয়ে ঈসায়ি তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত ব্যাপৃত। রোমানরা যেহেতু পেশাদার ফৌজি ও অস্ত্রের ভাষায় কথা বলতে অভ্যস্ত ছিল, এজন্যে তাদের সময়কালে গ্রিকদের মতো রূপ-সৌন্দর্যের পূজা

ব্যাপকতা লাভ করেনি। বরং তাদের সময়ে বাহুর শক্তিই ছিল সবার আরাধ্য। তারা ছিল শক্তির পূজারী। শক্তির এই নেশার কারণে তারা আল্লাহর সঙ্গে কথপোকথন ও সম্পর্ক স্থাপনকে অর্থহীন মনে করতো। শক্তি বৃদ্ধি করার জন্যে রোমান সাম্রাজ্যে দেশপ্রেমের বুলি খুব বেশি কপচানো হতো। তারা মনে করতো, জনগণের মাঝে ঐক্য ও রাষ্ট্রের শক্তি বৃদ্ধি করার সবচেয়ে বড় মাধ্যম দেশপ্রেম।

৩. মধ্যযুগ : ঈসায়ি যুগ

রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের পুনরুজ্জীবন আন্দোলনের পূর্ব পর্যন্ত এই এক হাজার বছরকে মধ্যযুগ বা অন্ধকার যুগ বলা হয়। এই সময় ফিলোসফির দর্শন ও শিক্ষা পর্দার আড়ালে চলে যায়। ধর্মীয় শিক্ষার চর্চাকেই সবাই সম্মান ও মূল্যায়নের মাণদণ্ড মনে করতো।

৪. রেনেসাঁস (Renaissance) বা জ্ঞানের পুনরুজ্জীবন আন্দোলন

এক হাজার বছর দীর্ঘ মধ্যযুগের অবসান হতেই শুরু হয় নতুন যুগের নতুন আন্দোলন। সূচিত হয় ধর্মের শেকল থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিজের ইচ্ছেমত সম্ভাব্য সব ধরনের স্বাধীনতা লাভের প্রয়াস। এই আন্দোলনের পেছনে অনেকগুলো অনুঘোটক ছিল। যেমন,

* ক্রুসেডীয় যুদ্ধে খ্রিস্টশক্তির পরাজয়।
* খ্রিস্টধর্মের নিজস্ব দুর্বলতা।
* জনমনে এ অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ে যে, খ্রিস্টধর্ম সমাজকে সঠিক পথ দেখাতে ব্যর্থ।
* পাদরিদের চারিত্রিক স্খলন ও অনৈতিক কর্মকাণ্ড।
* ইউরোপে ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি আকর্ষণ।
* অক্সফোর্ড ও ক্যামব্রিজের মতো বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা।
* সবচেয়ে বড় কারণ হলো, ১৪৫৩ ঈসাব্দে তুর্কিরা কনস্ট্যান্টিনোপল বিজয়ের পর সেখানে বসবাসরত গ্রিক দার্শনিক ও পণ্ডিতগণ ইউরোপে পাড়ি জমাতে শুরু করে। এই ফিলোসফিস্টদের প্রভাবে

মাত্র এক শতাব্দীর ভেতর ইউরোপের বুকে পুনরায় গ্রিকদর্শনের বিজয়ডঙ্কা বেজে ওঠে। জ্ঞানের পুনরুজ্জীবন বা বুদ্ধিবৃত্তির নতুন জাগরণের এই আন্দোলন ধর্মীয় শিক্ষাকে সমাজের বোঝা ও অর্থহীন কাজ অভিহিত করে, এর স্থলে গিক দর্শনপ্রসূত সন্তান— যুক্তিবাদ, মুক্তবুদ্ধির চর্চার ও মানবিকতাকে বরণ করে নেয়।

৫. Rationalism বা যুক্তিবাদের যুগ

পশ্চিমা ফিলোসফির পঞ্চম যুগ শুরু হয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দিকে। এ যুগের ব্যাপ্তি ১৭৭৫ ঈ. পর্যন্ত। এই যুগের ফিলোসফি মুক্তি পায় গ্রিকদর্শনের অনুকরণের পরাধীনতা থেকে। যুক্তিবাদের সবচেয়ে বিখ্যাত প্রবক্তা 'ডিকার্ট' (১৫৯৬ ঈ.-১৬৫০ ঈ.) ঈশ্বর বা প্রকৃতির শক্তিকে একটি যন্ত্র অভিহিত করে, তার আধ্যাত্মিক ক্ষমতা অস্বীকার করে। ডিকার্টের সবচেয়ে বড় বিভ্রান্তিকর দৃষ্টিভঙ্গি হলো—

> 'প্রতিটি মানুষের জন্যে এ অবকাশ রয়েছে যে, সে নিজের সত্তা ছাড়া সৃষ্টিজগতের প্রতিটি বস্তুকে সংশয়ের চোখে দেখবে।'

যুক্তিবাদের পরবর্তী স্টেপ হলো, সত্যের অস্তিত্ব অস্বীকার করা। ফরাসি দার্শনিক 'মনটেইন' (Montaigne)[৫] এর মন্তব্য হলো—

> 'শৈশবে আমার কাছে শশা খুবই প্রিয় ছিল; কিন্তু এখন আর ভালো লাগে না।'

উদাহরণটি দিয়ে সে বোঝাতো যে, সত্য কোনো পোক্ত জিনিস নয়। এর কোনো স্বাতন্ত্র্য নেই। বরং এটি একটি আপেক্ষিক বিষয়। সময় ও পাত্রভেদে এটি সবসময় বদলাতে থাকে।

---

[৫] মিশেল একেম দ্য মন্‌টেইন ছিলেন ফরাসী নবজাগরণের অন্যতম প্রভাবশালী লেখক। ইউরোপীয় সাহিত্যের ইতিহাসে তিনিই প্রথম প্রবন্ধ রচনাকে জনপ্রিয় করে তোলেন। আধুনিক সংশয়বাদের জনক। তিনি একজন রাজনীতিবিদ এবং দার্শনিক ছিলেন। জন্ম তারিখ : ২৮ ফেব্রুয়ারি, ১৫৩৩। জন্মস্থান : Château de Montaigne, Saint-Michel-de-Montaigne, ফ্রান্স। মৃত্যুর তারিখ এবং স্থান : ১৩ সেপ্টেম্বর, ১৫৯২, Château de Montaigne, Saint-Michel-de-Montaigne, ফ্রান্স। শিক্ষা : College of Guienne, University of Toulouse। সন্তান : Léonore de Montaigne। —অনুবাদক

অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরেজ দার্শনিক 'হিউম'[৬] (১৭১১ ঈ.-১৭৭৬ ঈ.) সবধরনের বিশ্বাসকে এই অজুহাত দাঁড় করিয়ে প্রত্যাখ্যান করে যে, 'এগুলোর সত্যতা যেমন কোনো বিজ্ঞান গবেষণাগারে পরীক্ষা করার সুযোগ নেই, তদ্রূপ এগুলো বুদ্ধির মাণদণ্ডেও উত্তীর্ণ নয়।'

বিজ্ঞানের পুনর্জাগরণ ও নিরেট যুক্তিচর্চার বুনিয়াদের ওপর প্রতিষ্ঠিত ফিলোসফি পশ্চিমাবিশ্বের ধর্ম ও রাজনীতি— দুটোকেই ব্যাপক প্রভাবিত করতে সমর্থ হয়। এর ফলে ধর্মীয় স্তরে সবচেয়ে বড় যে পরিবর্তনটি সাধিত হয় তাহলো, ধর্মের সংস্কার আন্দোলন সূচিত হয়। যা চার্চের একচ্ছত্র ক্ষমতা ধ্বংস করে দেয়।

আর রাজনীতির মাঝে এ পরিবর্তন আসে যে, শাসক পোপের বৈশ্বিক ধর্মীয় ক্ষমতার বলয় থেকে বেরিয়ে স্বাধীনতা লাভ করে। জাতীয়তার ভিত্তিতে রাজ্য গড়ে ওঠতে শুরু করে। সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে জাতীয়তা ও অঞ্চলভিত্তিক সাম্প্রদায়িকতা। ইটালির বিখ্যাত চিন্তাবিদ 'মিকাউলি' (১৪৬৯ ঈ.-১৫৩২ ঈ.) রাজনীতির নতুন মূলনীতি নিয়ে হাজির হয়। সে এ দর্শন পেশ করে যে, দেশ শাসন করতে হলে শাসকদেরকে অবশ্যই ধোঁকাবাজি, প্রতারণা ও শঠতার আশ্রয় নিতে হবে। আর দেশের শাসক অবশ্যই যেকোনো ধরনের জবাবদিহিতার বাধ্যবাধকতার উর্ধ্বে থাকবে।

৬. শিল্পবিপ্লবের যুগ

উনবিংশ শতাব্দীতে যখন শিল্পবিপ্লব সাধিত হয়, বিভিন্ন ধরনের মেশিনারি প্রক্রিয়া আবিস্কৃত হয়, তখন এর বদৌলতে পরকাল অস্বীকারকারীরা বিনাযুদ্ধে স্বর্গজয় করার মতো আনন্দে মেতে ওঠে। আসলে এ ছিল তাদের প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ওপর উন্মত্ত পরিশ্রমের ফসল। অর্থনৈতিক প্রবৃত্তির ফলে সমাজের মাঝে নতুন নতুন অসংখ্য

[৬]. ডেভিড হিউম (Allan Octavian Hume) (৬ June ১৮২৯ ৩১ July ১৯১২)। দার্শনিক। জন্মতারিখ : ৭ মে, ১৭১১। জন্মস্থান : এডিনবরা, যুক্তরাজ্য। মরার তারিখ ও স্থান : ২৫ আগস্ট, ১৭৭৬, এডিনবরা, যুক্তরাজ্য। শিক্ষা : এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়। কবরস্থান : Old Calton Burial Ground, এডিনবরা, যুক্তরাজ্য। —অনুবাদক

জটিলতা ও প্রশ্ন দেখা দেয়। এ জাতীয় প্রশ্নগুলোর সমাধান ও জটিলতা নিরসনের জন্যে নতুন সামাজিক দর্শন ও রাজনৈতিক রূপরেখা সামনে আসতে শুরু করে।

৭. দ্বিচারিতা ও মিথ্যা ধর্মের যুগ

ইতিহাসের এ সময়টি আদর্শিক কপটতা, মিথ্যা ধর্ম ও বানোয়াট ঐতিহ্যের শতাব্দী বলা হয়। এ সময়কালে অনেকগুলো মানসিকতা ও চিন্তাধারা অবাধে-অবলীলায় আত্মপ্রকাশ করে। পারস্পরিক মতভিন্নতা সত্ত্বেও এই দর্শনগুলো একই সঙ্গে সমাজে বিরাজমান থাকে। মানুষ দৃষ্টিভঙ্গির আদান-প্রদানে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। দুটি বিপরীত প্রান্তে বসেও কাজ চালিয়ে যাওয়া একটি সাধারণ বিষয়ে পরিণত হয়ে ওঠে। এই শতাব্দীর দুটি প্রশিদ্ধ দর্শন হলো—

প্রয়োগবাদ (Pragmatism)

এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে— 'কোনো চিন্তাধারা বা দৃষ্টিভঙ্গি সত্তাগতভাবে সঠিক বা ভুল হয় না; বরং প্রতিটি চিন্তাধারার মূল্য ও যথার্থতা নিরুপিত হবে বস্তুবাদি জীবনে তার প্রভাব ও পরিণতি পর্যবেক্ষণ করে।'

যৌক্তিক ইতিবাচকতা (Logical Positivism)

এই মতাদর্শের সারাংশ হলো, 'নাম কোনো বস্তুকে বোঝায় না; বরং প্রতিটি শব্দ ও বাক্য বলা হয় বিশেষ অবস্থাতে (Situation)। কাজেই বাক্যের মাঝে অর্থ না খুঁজে আমাদের করণীয় হবে, ওই অবস্থার নিরীক্ষণ করা, যেই অবস্থা চলাকালে বাক্যটি বলা হয়েছিল।'

এই মতাদর্শের প্রবক্তাদের বক্তব্য হলো, বাক্য থেকে কোনো কিছু প্রমাণিত হতে পারে না, যতক্ষণ না তার প্রেক্ষাপট দেখা হয়। তারা বোঝাচ্ছে যে, প্রভু, রাসূল, আখেরাত, রূহ— এ জাতীয় শব্দগুলোকে একটি বিশেষ প্রেক্ষাপটের প্রতিক্রিয়া মানা যেতে পারে। এগুলোকে যেমন সত্য বলার সুযোগ নেই, তেমনই মিথ্যা বলাও যাবে না। হয়তো একসময় এগুলো অর্থবোধক ছিল; কিন্তু এখন অর্থহীন হয়ে পড়েছে।

৮. ইসলামের পুনরুজ্জীবন : একবিংশ শতাব্দী

এই যুগে আমরা যত চিন্তাধারা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মতাদর্শ দেখতে পাচ্ছি, সবগুলোই বিংশ শতাব্দীর ফসল। ব্যবধান রচিত হয়েছে এখান থেকে যে, ১৯৮০ সালের আফগান জিহাদ, সেভিয়েত ইউনিয়নের শোচনীয় পরাজয়, কমিউনিজমের ব্যর্থতা, নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডারের ঘোষণা এবং তা চাপিয়ে দেওয়ার জন্যে মুসলিম জাহানের ওপর আমেরিকার একের পর এক আক্রমণের পর একদিকে 'ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গির' চিরন্তনত্ব ও অন্যদিকে পশ্চিমা চিন্তাধারাগুলোর অন্তসারশূন্যতা প্রমাণিত হয়েছে। মুসলিম জাহানের ওপর নানা ধরনের পরীক্ষা ও বিপর্যয় চাপিয়ে দেওয়ার পরও ইসলাম সমুজ্জ্বল। পশ্চিমাবিশ্ব সব ধরনের উপকরণ সর্বশক্তি দিয়ে প্রয়োগ করার পরও এখন পর্যন্ত সফলতার মুখ দেখেনি।

■ পশ্চিমাবিশ্ব প্রসূত বিকল্প জীবনব্যবস্থা ■

ফিলোসফির বিভিন্ন যুগ ও সেই যুগগুলোতে গজিয়ে ওঠা দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাবে পশ্চিমাবিশ্বে তিনটি বড় ধরনের আন্দোলন আত্মপ্রকাশ করে। এই আন্দোলনগুলোর প্রতিটিই স্রেফ যুক্তিবাদ ও বস্তুবাদের ওপর ভর করে আবির্ভূত হয়েছিল—

১. হিউমেনিজম বা মানবধর্ম
২. ইনলাইটেনমেন্ট মুভমেন্ট বা আলোকায়ন আন্দোলন
৩. রোমান্টিকতা।

১. হিউমেনিজম (Humanism) বা মানবধর্ম

হিউমেনিজম বা মানবধর্মের জন্ম আর বিজ্ঞানের পুনর্জাগরণ— এ দুটো একসঙ্গেই ঘটেছে। যেখানে পৃথিবীতে হাজার বছর ধরে এই বাস্তবতা সবাই স্বীকার করে আসছে যে, আদমসন্তানরা প্রজাতি হিসেবে 'মানুষ'। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সে হলো, 'বান্দা'। কিন্তু হিউমেনিজমের আন্দোলন মানুষের 'বান্দা' হওয়ার অবস্থান অস্বীকার করে তাকে 'স্বাধীন সদস্য' এর স্থান দিচ্ছে। মানবধর্মের অর্থ হলো, বিশ্বচরাচরে যা কিছু আছে, এর মধ্য হতে মানুষকেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিশ্বাস করা। কাজেই প্রতিটি বিষয় মানুষের দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা-ভাবনা করতে হবে।

২. আলোকায়ন আন্দোলন (Enlightenmaent Movement)

ইনসাইক্লোপিডিয়া বৃটানিকায় 'ইনলাইটেনমেন্ট মুভমেন্ট'-এর সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে—

> a European intellectual movement of the 17th and 18th centuries in which ideas concerning God, nature, and humanity were synthesized into a

worldview that gained wide assent in the West and that instigated revolutionary developments in art, philosophy, and politics. Central to Enlightenment thought were the use and celebration of reason, the power by which humans understand the universe and improve their own condition. The goals of rational humanity were considered to be knowledge, freedom, and happiness.

'এটি সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর একটি ইউরোপীয় বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলন। যেখানে ঈশ্বর, যুক্তি, প্রকৃতি ও মানবতা সম্পর্কিত ধারণাগুলোকে একটি বিস্তৃত পার্থিব দৃষ্টিকোণের সঙ্গে এমনভাবে উপস্থাপন করে, যা শিল্প, দর্শন ও রাজনীতির মাঝে বৈপ্লবিক উন্নতি উদ্ভাবন করে। 'ইনলাইটেনমেন্ট মুভমেন্ট [আলোকায়ন আন্দোলন]' এর দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে যে ব্যক্তি মহাবিশ্ব বুঝতে চায় এবং নিজস্ব অবস্থা উন্নত করতে চায় তাকে অবশ্যই যুক্তিনির্ভর হতে হবে। যুক্তিপ্রিয় মানুষ তথ্য, স্বাধীনতা ও সুখ অর্জনের প্রয়াসে লিপ্ত থাকে।'

ইনলাইটেনমেন্ট মুভমেন্টের দৃষ্টিভঙ্গি হলো, মানববুদ্ধি তিনটি মাধ্যম ব্যবহার করে মূল বাস্তবতা পর্যন্ত পৌঁছুতে পারে। সেই তিনটি মাধ্যম হলো— নিরীক্ষণ, উদ্ভাবন ও মেধা।

নিরীক্ষণের অর্থ হলো, ছোট ছোট বিষয়গুলো পর্যবেক্ষণ করে কোনো বিধান গ্রহণ করা।

আর উদ্ভাবনের ব্যাখ্যা হলো, একটি মৌলিক নীতি চিন্তা-ভাবনা করে সেটিকে ছোট ছোট বিষয়গুলোর ওপর প্রয়োগ করে মৌলিকত্ব বের করা।

আর মেধার ব্যাখ্যা হলো, প্রাকৃতিক অনুভূতিশক্তিগুলোর মাধ্যমে কোনো বস্তুর ভালো-মন্দ হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।

কাজেই ধর্মীয় পথনির্দেশনার কোনো ধরনের প্রয়োজনীয়তা নেই।

৩. রোমান্টিসিজিম (Romanticism)

ইনসাইক্লোপিডিয়া বৃটানিকায় 'রোমান্টিসিজিম'-এর সংজ্ঞা এভাবে দেওয়া হয়েছে—

> **Romanticism**, attitude or intellectual orientation that characterized many works of literature, painting, music, architecture, criticism, and historiography in Western civilization over a period from the late 18th to the mid-19th century.
>
> 'রোমান্টিকতাবাদ হচ্ছে অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে সূচিত হয়ে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ব্যাপৃত সময়কালে পশ্চিমাবিশ্বে প্রভাব সৃষ্টিকারী একটি বুদ্ধিবৃত্তিক মনোভাব, যা সাহিত্য, চিত্রকলা, সঙ্গীত, স্থাপত্য শিল্প, সমালোচনা ও ইতিহাসবিদ্যায় গভীর প্রভাব ফেলেছে।'

রোমান্টিকতাবাদও পঞ্চেন্দ্রীয়, যুক্তি ও মেধাকে জ্ঞানের আসল মাধ্যম মনে করে। এর বাইরে তারা অন্য কোনো বহিরাগত বিদ্যাকে স্বীকার করে না।

এই আন্দোলনগুলোর প্রভাবে এ কথা স্বতসিদ্ধ হয়ে পড়ে যে, মানুষের ইচ্ছা ও পসন্দই ভালো-মন্দ নির্ণয় করে। কাজেই একটি আদর্শ সমাজ গঠন করার জন্যেও মানুষের ইচ্ছাশক্তিই মূল চালিকাশক্তি ও নিয়ামক।

এর পাশাপাশি এ কথাও সবার স্বীকৃতি আদায় করে নেয় যে, মানুষের সবচেয়ে বড় ইচ্ছা হলো, তার স্বাধীনতা। অর্থাৎ মানুষ যা ইচ্ছা, তা যেন অর্জন করতে পারে। মানুষের উন্নতিও এই স্বাধীনতার ওপর নির্ভর করে। হ্যাঁ, মানুষের স্বাধীনতার শেষ সীমা কী? সে কী ধরনের স্বাধীনতা ভোগ করবে? এ ব্যাপারে চিন্তাবিদ ও দার্শনিকদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। তারা এর জন্যে কয়েক ধরনের জীবনপদ্ধতি আবিস্কার করেছে। সেগুলোর মধ্যে সেক্যুলারিজম, লিবারেলিজম ও কমিউনিজম সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। যদিও এই মতবাদগুলোর পরস্পরে মতবিরোধ রয়েছে; কিন্তু সবগুলো মতবাদ এ একটি কথার ওপর একমত যে,

'ব্যক্তিস্বাধীনতা'-ই সর্বোৎকৃষ্ট লক্ষ্য। মানুষ যেন যা ইচ্ছে অর্জন করতে পারে। এই তিনটি মতাদর্শ এ বিষয়ে একমত যে, ১. ধর্মকে অস্বীকার করতে হবে। ২. খাঁটি যুক্তিবাদে বিশ্বাস করতে হবে। ৩. মানবিকতা। তবে এই তিন লক্ষ্য পূরণের পথ কী? সে বিষয়ে এগুলোর পরস্পরে মতপার্থক্য রয়েছে।

কাজেই আমরা এখন এই তিন মতবাদের স্তরভিত্তিক নিরীক্ষণ নেব।

সেক্যুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ

সেক্যুলারিজম মানবজীবনকে দু' ভাগে ভাগ করে। ব্যক্তিজীবন আর সামাজিক জীবন। ব্যক্তিজীবনে কেউ যদি ধর্মের ওপর আমল করতে চায়, তা সে পারবে। সামাজিক জীবন নামে অপর যেই অংশ আছে, সেখানে ধর্মের অনুপ্রবেশের কোনো ধরনের সুযোগ নেই। এক্ষেত্রে যুক্তিই শিরোধার্য।

লিবারেলিজম বা প্রজাতন্ত্র

লিবারেলিজম তিনটি মূলনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত—

১. স্বাধীনতা ২. সাম্য ৩. ন্যায্যতা।

স্বাধীনতার ব্যাখ্যা হলো, প্রত্যেক মানুষ তার স্বাধীনতা ও মনোকামনা ব্যক্তিগতভাবে প্রকাশ করতে পারবে। কিন্তু যেহেতু এ পরিমাণ স্বাধীনতা অন্যদের জীবনে বিঘ্ন ঘটাতে পারে, এজন্যে জীবনকে দু' ভাগে ভাগ করা হবে। পাবলিক লাইফ (সামাজিক জীবন) আর প্রাইভেট লাইফ (ব্যক্তিজীবন)। পাবলিক লাইফে মানুষ আবশ্যিক সামাজিক বিধি-নিষেধ অনুসরণ করবে। আর প্রাইভেট লাইফে সে যা ইচ্ছা করতে পারবে। মদ পান করুক, অপকর্ম করুক, ঈশ্বরের উপাসনা করুক, সব ব্যক্তির ইচ্ছা।

সাম্যের ব্যাখ্যা হলো, সমস্ত মানুষ আইনি ও রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে সমান। আইনি দৃষ্টিকোণ থেকে সমান এভাবে যে, আইন প্রত্যেককে ব্যক্তিগত জীবনে যা ইচ্ছা করার অনুমতি দেয়। আর রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে সমান এভাবে যে, প্রত্যেকের ভোট সমান।

লিবারেলিজমের দৃষ্টিতে ন্যায্যতার ব্যাখ্যা হলো, প্রত্যেক মানুষের লক্ষ্য সমাজে একসমান সমীহ পাবে। হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা যতটা সমীহ পাবে, মদশালা প্রতিষ্ঠার ইচ্ছাও অনুরূপ সমীহ পাবে।

কমিউনিটারিনিজম (Communitarianism)

এই মতবাদের উদ্ভাবক হলো, রুসো[৭], হেগেল[৮] ও মার্কস[৯]। তাদের মতে

---

[৭] জঁ-জাক রুসো (Jean-Jacques Rousseau) (২৮শে জুন, ১৭১২-২রা জুলাই, ১৭৭৮) ফরাসি দার্শনিক, সমাজবিদ, আলোকিত যুগের অন্যতম প্রবক্তা। রুসোর রাজনৈতিক চিন্তাধারা ফরাসি বিপ্লবকে যেমন প্রভাবিত করেছে, তেমনি পরবর্তীকালে জাতীয়তাবাদের বিকাশেও ভূমিকা রেখেছে। জন্মসূত্রে সুইজারল্যান্ডের অধিবাসী হলেও রুসো ছিলেন ফরাসি জ্ঞানালোক আন্দোলনের অন্যতম প্রতিনিধি এবং ইউরোপের প্রগতিবাদী ও গণতান্ত্রিক সমাজচেতনার প্রধান পৃষ্ঠপোষক। তিনি আত্মজৈবনিক রচনাশৈলিতে আধুনিক ধারার সূত্রপাত করেন এবং তাঁর লেখনীতে মন্ময়ী (subjective) চেতনার বিকাশের প্রভাব হেগেল ও ফ্রয়েডসহ অনুবর্তী অনেক চিন্তাবিদের মাঝেই সুস্পষ্ট।

তাঁর রচিত উপন্যাসগুলো ছিল একদিকে অষ্টাদশ শতকের জনপ্রিয় বেস্টসেলার এবং একই সাথে সাহিত্যে রোমান্টিকতাবাদের অন্যতম উৎস। তাত্ত্বিক ও সুরকার হিসাবে পাশ্চাত্য সঙ্গীতেও তাঁর অসামান্য অবদান রয়েছে। —অনুবাদক

[৮]. গেয়র্গ ভিলহেল্ম ফ্রিডরিখ হেগেল (Georg Wilhelm Friedrich Hegel) (আগস্ট ২৭, ১৭৭০– নভেম্বর ১৪, ১৮৩১) একজন জার্মান দার্শনিক এবং জার্মান ভাববাদের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ছিলেন। বাস্তবতার ক্ষেত্রে তাঁর ঐতিহাসিক ও ভাববাদী অবস্থান ইউরোপীয় দর্শনকে বিপ্লবী করে এবং মহাদেশীয় দর্শন ও মার্কসবাদের গুরুত্বপূর্ণ অগ্রদূত হিসবে বিবেচিত হয়। জগত বা সত্যের ক্ষেত্রে জ্ঞেয় ও অজ্ঞেয়র দ্বৈত রূপ হেগেল অস্বীকার করলেও তাঁর নিকট মূল হচ্ছে ভাব; বস্তু নয়। যা কিছু জ্ঞেয় বা দৃশ্যমান সবই হচ্ছে ভাবের প্রকাশ ও বিকাশ। এছাড়া ভাবের চরম বিকাশ জার্মান রাষ্ট্রযন্ত্রে ঘটেছে বলে হেগেলের রাজনৈতিক ব্যাখ্যা পরবর্তীকালে স্বৈরতান্ত্রিক ও ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রযন্ত্রের আদর্শগত হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হতে পেরেছে।

বস্তুত হেগেল দর্শন থেকে উত্তরকালে দুটি পরস্পরবিরোধী ধারার বিকাশ ঘটেছে। এর একটি হচ্ছে মার্কসবাদ বা দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ, আর অন্যটি হচ্ছে নব ভাববাদ ও স্বৈরতান্ত্রিক রাজনৈতিক মতবাদ। —অনুবাদক

[৯] কার্ল হাইনরিশ মার্ক্স (Karl Heinrich Marx) (৫ই মে, ১৮১৮–১৪ই মার্চ, ১৮৮৩) একজন প্রভাবশালী জার্মান সমাজ বিজ্ঞানী ও মার্ক্সবাদের প্রবক্তা। জীবিত অবস্থায়

প্রত্যেক মানুষ ব্যক্তিগতভাবে ভালো-মন্দের সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার রাখে না। বরং এর সিদ্ধান্ত হবে মানবসম্প্রদায়ের সামষ্টিক স্বার্থ দেখে। এভাবে কমিউনিটারিনিজম থেকে মানুষের স্বাধীনতার সামষ্টিক দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি হয়।

পরবর্তীকালে এই দৃষ্টিভঙ্গি অনেকগুলো শাখায় বিভক্ত হয়ে গেছে। এগুলোর মধ্য হতে দুটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ—

১. ন্যাশনালিজম (Nationalism) বা জাতীয়তাবাদ।
২. সোশালিজম (Socialism) বা সমাজতন্ত্র।

ন্যাশনালিজম (Nationalism) বা জাতীয়তাবাদের বক্তব্য হলো, মানুষকে তার সামষ্টিক স্বাধীনতা প্রকাশ করতে হবে জাতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে। এখন যেহেতু জাতীয়তাবাদ কখনো বংশীয় বুনিয়াদের ওপর, আবার কখনো ভৌগলিক বুনিয়াদের ওপর গড়ে ওঠে, এজন্যে জাতীয়তাবাদ দু' ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে—

১. ভৌগলিক জাতীয়তাবাদ (Civil Grounded Nationalism)

এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে একই রাষ্ট্রের অধিবাসী হওয়ার মাপকাঠিতে এক জাতি সাব্যস্ত হবে। এই মতাদর্শের লক্ষ্য হলো, নিজ জাতির জন্যে যত বেশি সম্ভব স্বাধীনতা, শক্তি ও উপকরণ সংগ্রহ করা।

২. বংশীয় জাতীয়তাবাদ (Ethical/Racial geound Nationalism)

এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে নির্দিষ্ট বংশের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের ভিত্তিতে এক জাতি সাব্যস্ত হবে।

বিগত শতাব্দীগুলোতে হিটলারের নাৎসিবাদ ছিল বংশীয় জাতীয়তাবাদের ধ্বজাধারী। আর মুসোলিনির ফ্যাসিজম ছিল ভৌগলিক জাতীয়তাবাদের ধ্বজাধারী।

সেভাবে পরিচিত না হলেও মৃত্যুর পর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবীদের কাছে তিনি জনপ্রিয় হয়ে উঠেন। বিংশশতাব্দীতে সমগ্র মানবসভ্যতা মার্ক্সের তত্ত্ব দ্বারা প্রবলভাবে আলোড়িত হয়।

সোভিয়েত ইউনিয়ন সমাজতন্ত্রের পতনের পর এ তত্ত্বের জনপ্রিয়তা কমে গেলেও তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে মার্ক্সবাদ এখনও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। —অনুবাদক

সোশালিজম (Socialism) বা সমাজতন্ত্র

সোশালিজমের বক্তব্য হলো, মানবজাতির প্রকৃত প্রতিনিধিত্বশীল স্তর হলো, মজদুর শ্রেণি। তাদের স্বার্থ ও ইচ্ছাকে গোটা মানবজাতির স্বার্থ জ্ঞান করে সমাজ পরিচালিত হবে।

সমাজতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের সবগুলো শাখা হলো, পূর্বে আলোচিত কমিউনিটারিনিজমের শাখা। আর লিবারেলিজম হচ্ছে কমিউনিটারিনিজমের ভাই। এই দৃষ্টিভঙ্গিগুলোর কোনোটাই ইসলামের সম্পর্কে কোনো ধরনের সম্পর্ক রাখে না। কেননা এগুলোর উদ্দেশ্য শুধু দুনিয়াদারিত্ব, লাভপ্রবণতা ও প্রবৃত্তির অনুসরণ। এই মতাদর্শগুলো স্বাধীনতা, সাম্য, ন্যায্যতা ও উন্নতির যেই মাণদণ্ড পেশ করে এবং এগুলোর জন্যে যেই পথের নির্দেশ করে, তার প্রথম পদক্ষেপই হলো মানুষকে ধর্ম থেকে বিমুখ করে ফেলা।

পুঁজিবাদ ও সোশালিজম

পুঁজিবাদ (Capitalism)

পুঁজিবাদ হলো লিবারেলিজমের শাখা। এই মতবাদ মনের চাহিদা পূরণ করার জন্যে ব্যক্তিকে সর্বোচ্চ স্বাধীনতা ও অধিকার প্রদানের প্রবক্তা। কেননা এই মতবাদের বক্তব্য হলো, ব্যক্তি নিজেই ভালো-মন্দ নির্ধারণ করার যোগ্যতা রাখে।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সংজ্ঞা হলো,

> 'এটি এমন এক সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সিস্টেম, যা সম্পদ, বাণিজ্য ও শিল্পে ব্যক্তিমালিকানা স্বীকার করে এবং সফল সংগঠন ও ব্যক্তিদেরকে সর্বোচ্চ সম্ভাব্য মুনাফা অর্জন করার পথ সুগম করে।'

পুঁজিবাদি ব্যবস্থার মূল নীতি তিনটি—

১. বস্তুগত লাভ ও লোভই মানুষের চিন্তা ও কর্মের একক চালিকাশক্তি।
২. ধর্মীয় নৈতিকতা নিষ্প্রয়োজনীয়।
৩. সামষ্টিক লাভের বলয় সর্বোচ্চ বিস্তৃত হওয়া আবশ্যক।

পুঁজিবাদী সমাজে রাষ্ট্র কখনই শিল্প ও বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডে কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ করে না। উপকরণের ওপর মানুষের ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণ ও অধিগ্রহণ ব্যাপক হয়ে থাকে। এর ফলে ছোট পুঁজিপতি বড় পুঁজিপতি হয়ে যায়। পুঁজিপতিদের বিভিন্ন সংগঠন গড়ে ওঠে। এই সংগঠনগুলো বেশির থেকে বেশি মুনাফার জন্যে শতভাগ সুবিন্যস্ত ও বিস্তৃতিপ্রয়াসী হয়ে ওঠে। পরবর্তীকালে এই গুটিকয়েক ব্যক্তিবর্গের হাতে পুরো জাতির সম্পদ কুক্ষিগত হয়ে পড়ে। নৈতিক মূল্যবোধ ধূলোধুসরিত হয়। পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি ঘটতে থাকে। এর ফলে ধনী আরো বেশি ধনী, আর দরিদ্র আরো বেশি দরিদ্রে পরিণত হয়।

সমাজতন্ত্র (Socialism)

সোশালিজম হলো কমিউনিটারিনিজমের উদর থেকে উদ্ভূত মতবাদ। যা ব্যক্তির যাবতীয় খায়েশ পূরণ করার জন্যে ব্যক্তির স্থলে সমাজকে সর্বোচ্চ অধিকার প্রদান করার নির্দেশ করে। কেননা এর মতে, ব্যক্তি নিজস্বভাবে ভালো-মন্দ নির্ধারণ করতে পারে না; এ কাজটি সুন্দরভাবে সম্পন্ন করতে পারবে মানবজাতির সম্মিলিত প্রয়াস।

সমাজতন্ত্রের সংজ্ঞা

সোশালিজম একটি সামাজিক ও অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি, যা ব্যক্তিমালিকানা বা সম্পদ এবং প্রাকৃতিক উপকরণগুলোকে নিয়ন্ত্রণের আহ্বান করে।

সোশালিজম মনে করে, পুঁজিবাদি (Capitalism) অর্থব্যবস্থার কারণে জনগণ দু' ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। একটি দল হলো পুঁজিপতি (Capitalist)। অপর দল হলো শ্রমজীবি (Prolitariat)। পুঁজিপতি তার পুঁজির শক্তি দিয়ে শ্রমজীবি শ্রেণিকে শোষণ (Expoloition) করে। সোশালিজম সেই শোষণ থেকে মুক্তির পথ বাতলে দেয়।

সোশালিজমের জনক 'কার্ল মার্কস' ১৮১৮ সালে জার্মানিতে জন্মগ্রহণ করে। সে বংশগতভাবে ইহুদি ছিল। সে 'সংগ্রামী বস্তুবাদ' এর একটি নতুন দর্শন নিয়ে হাজির হয়। যেখানে সে সমাজের সকল পরিবর্তন ও বিপ্লবের বস্তুবাদি ও অর্থনৈতিক কারণ পেশ করে। তার বক্তব্য ছিল, মানবজীবনের নির্ভরতা হলো অর্থনীতির ওপর। অর্থনৈতিক কর্মশক্তিই ধর্ম, সভ্যতা, দর্শন, সাহিত্য ও দৃষ্টিভঙ্গির মাঝে বিভিন্ন পরিবর্তন সাধন করে থাকে।

মার্কস ইতিহাস অধ্যয়নের ওপর গুরুত্বারোপ করে বলে, 'মানবজাতির বিভিন্ন শ্রেণির সংঘাতের ইতিহাস অধ্যয়ন করা খুবই জরুরি। শ্রেণিগত সংঘাতই সত্য নির্মাণ করে। এই সংঘাতের ইতিহাস পড়ার মাধ্যমে সত্যের পরিচয় লাভ করা যায়। ইতিহাসের এমন পাঠের আলোকেই মার্কস তার বিখ্যাত দৃষ্টিভঙ্গি 'শ্রেণিসংঘাত' (Class Struggle)-এর দর্শন নিয়ে হাজির হয়। যার সারাংশ হলো, প্রতিটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা যখন উন্নতির একটি বিশেষ স্তরে পৌঁছে তখন কিছু নতুন নতুন শক্তি

দৃশ্যপটে চলে আসে, যেই শক্তিগুলো অর্থনীতির উৎপাদনমূলক কর্মকাণ্ডে অংশিদার হয়। তারা প্রচলিত ব্যবস্থাপনার শ্রেণিভিত্তিক বিভাজন ও মালিকানা সংক্রান্ত আইন-কানুন পরিবর্তন করার দাবি তুলতে শুরু করে, যেন তারা উপার্জিত আয় থেকে বেশি অংশ লাভ করে। তখন প্রভাবশালী শ্রেণি এই দাবি উপেক্ষা করে। কিন্তু অধীনস্থ শ্রেণি এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। এভাবেই জন্ম নেয় শ্রেণিসংঘাত। মার্কসের বক্তব্য হলো, এই সংঘাতের পরিণতিতে সমাজের মূল্যবোধ পরিবর্তনকারী বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। এই সংঘাতে সবশেষে অধীনস্থ শ্রেণি বিজয়ী হয় এবং ক্ষমতাশালী শ্রেণির পরাজয় ঘটে।

মার্কসের এই দর্শন আরেক ইহুদি লিডার 'লেনিন' প্রয়োগ করে দেখাতে সক্ষম হয়। সে ১৯১৭ সালে রাশান সাম্রাজ্যের গদি উল্টে দিয়ে সফলতার সঙ্গে 'কমিউনিস্ট বিপ্লব' সংঘটিত করে। প্রতিষ্ঠা করে এমন একটি ধর্মবিদ্বেষী রাষ্ট্র, যা ইসরাইলের ঘোরতর সমর্থক ও মুসলিমদের নিকৃষ্টতম শত্রু।

সোশালিজম ও কমিউনিজমের মাঝে পার্থক্য

* সাধারণত সোশালিজম শব্দ দ্বারা একটি বিশেষ অর্থব্যবস্থাকে বোঝানো হয়। আর কমিউনিজম শব্দ দিয়ে অর্থব্যবস্থা ও রাজনৈতিক আন্দোলন— দুটোকেই বোঝানো হয়।
* সোশালিজম হলো আন্দোলনের প্রথম ধাপ। এ সময় সাময়িকভাবে জনস্বার্থের দিকে তাকিয়ে রাষ্ট্রের ভূমিকা মেনে নেওয়া হয় এবং সমস্ত এক্তিয়ার তাকে দিয়ে দেওয়া হয়। কমিউনিজম হলো সোশালিজমের শেষ ধাপ। এখানে এসে রাষ্ট্রের ভূমিকা পুরোপুরি নিঃশেষ হয়ে যায়। সরাসরি মজদুর শ্রেণির আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

সোশালিজমের বাহ্যিক লক্ষ্য ও মূল লক্ষ্য

বাহ্যত সোশালিজমের উদ্দেশ্য হিসেবে এ কথাগুলো বলা হয় যে,

* মজদুর শ্রেণিকে পুঁজিপতির শোষণের কবল থেকে উদ্ধার করা।
* ধনী-গরিব আর মালিক-মজদুরের বৈষম্য নিঃশেষ করে একটি শ্রেণিবৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করা।

* সমাজের সকল সদস্যের জন্যে তার সকল মৌলিক প্রয়োজন, অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা।

কিন্তু বাস্তবতা হলো, উপরিউক্ত লক্ষ্য-উদ্দেশ্যগুলো হলো স্রেফ বাহ্যিক শ্লোগান। সোশালিজমের আসল লক্ষ্য হলো, মানবজাতিকে ধর্ম থেকে মুক্তি দিয়ে, প্রবৃত্তিপূজা ও ইহুদিজমের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা। এই সোশালিজমের প্রবর্তক থেকে শুরু করে সমস্ত শীর্ষস্থানীয় লিডার ইহুদি ছিল। তারা মূলত সামাজিক বিপ্লবের কাঁচকলা দেখিয়ে রাশিয়ার মত রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব বগলদাবা করেছিল।

ইসলামি সোশালিজম

অষ্টাদশ শতাব্দীতে কমিউনিস্টদের কাজের পদ্ধতি ছিল, জনগণের মাঝে তাদের অর্থব্যবস্থা জনপ্রিয় করার প্রয়াস চালানো। যারা এই মতবাদের দৃঢ় সদস্য হয়ে উঠতো তাদেরকে পরবর্তীকালে তারা ধর্মহীনতা ও নাস্তিকতার দিকে আকর্ষণ করতো।

ধর্মের ব্যাপারে লেনিনের আসল অভিমত হলো, 'যতক্ষণ না পৃথিবীর বুক থেকে ধর্মের অস্তিত্ব নিঃশেষ হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত ধর্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা প্রত্যেক সোশালিস্টের আবশ্যিক দায়িত্ব।' [মাসিক লেবার, ডিসেম্বর ১৯২৬ ঈ.]

কিন্তু মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর মাঝে সোশালিজমের জাল ছড়িয়ে দেওয়ার জন্যে লেনিন এ প্রস্তাব পেশ করে যে, 'আমাদেরকে এই আন্দোলন পরিচালনা করার জন্যে প্রাচ্যে ধর্মের দুয়ার দিয়ে প্রবেশ করতে হবে।' [সমাজতন্ত্রমনা আলেমদের ভূমিকা : ৯]

সেমতে সমাজতন্ত্রীরা মুসলিমবিশ্বে ধর্মের নাম নিয়ে এবং ইসলামি সমাজতন্ত্রের পরিভাষা ও বুলি কপচে জনগণকে ধর্মচ্যুত করার কার্যক্রম শুরু করে দেয়। তারা বলে বেড়াতো, 'ইসলাম এমন এক ধর্ম, যা অর্থনৈতিক সাম্যের পতাকাবাহী। ইসলাম সবসময় ধনী-গরিবের ব্যবধান বিলোপ করে। নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য ছিল, অর্থনৈতিক শোষণের পথ বন্ধ করা।'

সমাজতন্ত্রীদের এই আহ্বান জনগণের মন-মস্তিষ্কের মাঝে এ ধারণা

গেথে দেয় যে, 'ইসলামও সোশালিজমের মত একটি অর্থব্যবস্থা ও রাজনৈতিক দস্তুর।'

আলোচনার সারাংশ

পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা আর সমাজতন্ত্র– উভয় মতবাদের চলার পথ ভিন্ন হলেও অভীষ্ট লক্ষ্য কিন্তু একটাই। এ দুটি মতবাদ মূলত পুঁজিবাদেরই প্রকার। একটি হলো, লিবারেল পুঁজিবাদ, আর অপরটি হলো, সমাজতান্ত্রিক পুঁজিবাদ।

সমাজতন্ত্রও পুঁজিবাদের মতো বস্তুবাদি স্বার্থকে প্রধান লক্ষ্য মনে করে এবং আধ্যাত্মিক শক্তিকে অর্থহীন সাব্যস্ত করে। যার কারণে, এ দুটি মতবাদের কোনোটাই কোনোভাবে ধর্মের আধিপত্য সহ্য করতে পারে না। দ্বিতীয়ত পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র মৌলিকভাবে এক হওয়ার আরেকটি পর্যবেক্ষণপ্রসূত দলিল হলো, এ দুটি ব্যবস্থা যে সমস্ত সভ্যতার জন্ম দিয়েছে, সেগুলোর মাঝে কখনই কোনো ফারাক পরিলক্ষিত হয়নি।

বাস্তবতা হলো, পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র— উভয়টিই ইহুদিদের প্রতারণার জাল। এরা হলো লুটেরাদের এমন দুটি দল, যারা নিজেদের লুটতরাজের চতুর্সীমা নির্ধারণ করে নিয়েছে এবং এ দলদুটো নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার স্বার্থে পরস্পরে অদৃশ্য বন্ধন তৈরি করে রেখেছে। এ দুটি মতবাদের বিবাদ ও কলহের নেপথ্যেও একটি গভীর ষড়যন্ত্র কাজ করে যাচ্ছে। তা হলো, কখনো যদি কোনো রাষ্ট্র বা জনগণ এ দুটির কোনো একটির প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে মুক্তির চেষ্টা করে তখন তৎক্ষণাৎ দ্বিতীয় মতবাদটি হাজির হয়ে কোলে তুলে নেয়। যার ফলে মুক্তির বিকল্প পথ অনুসন্ধানকারীরা কোনোভাবেই তৃতীয় মতবাদের পথ খুঁজে পায় না।

পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের উপর্যুক্ত নিরীক্ষণের মাধ্যমে এই বাস্তবতা দিবালোকের মতো স্পষ্ট হচ্ছে যে, ইসলামি সমাজে অর্থব্যবস্থা হিসেবে যেমনিভাবে পুঁজিবাদ গ্রহণযোগ্য নয়, তেমনই সমাজতন্ত্রও গ্রহণযোগ্য নয়। অন্যসব সেক্টর বাদ দিয়ে যদি শুধু অর্থব্যবস্থা হিসেবেও এ দুটির কোনো একটিকে সমর্থন দেওয়া হয়, তখনও এর কারণে পাপাচার ও

গুমরাহির পথ খুলে যাবে। কারণ, সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো, এ দুটি অর্থব্যবস্থার প্রতিটিই অপার্থিব ঈমান ও বিশ্বাসের প্রতিপক্ষ। যা নিরেট কুফুরি ছাড়া অন্য কিছু নয়। কেননা এ দুটি মতবাদ সরাসরি বস্তুবাদের সন্তান এবং জন্মগতভাবে এই মতবাদদুটো ধর্ম, আসমানি নির্দেশনা ও স্রষ্টার দাসত্বের ঘোরতর অস্বীকার করে।

লিবারেলিজম, সেক্যুলারিজম, সোশালিজম-সহ সবগুলো ইজম বস্তুবাদ, প্রবৃত্তিপূজা ও মানবতাবাদের সৃষ্টি। যেখানে মানুষকে স্রষ্টার দাস মনে না করে পুরোপুরি স্বাধীন স্বীকার করা হয়। কোনটা ব্যক্তির প্রয়োজন আর কোনটা তার খায়েশ— যেখানে সেই পার্থক্য নেই। প্রবৃত্তির এই অন্ধপূজার কারণে জীবনোপকরণের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে ব্যক্তি ও গোষ্ঠী অন্ধের মতো দৌড়ে চলেছে। এর ফলে বিশ্বঅর্থনীতির ভারসাম্য ভেঙে পড়ছে। কাজেই বিশ্বমানবতাকে এই বিপর্যয় থেকে মুক্তি পেতে হলে, অবশ্যই এসব ইজম ছুড়ে ফেলে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিতে হবে।

- التنصير تعريفه، أهدافه وسائله : عبد الرحمن بن عبد الله الصالح
- مذكرة التنصير : شيخ سلمان بن فهد العودة
- آخری صلیبی جنگ حصہ دوہم : عبدالرشید ارشد
- عہدِ مغلیہ میں انگریزوں کا جال : علامہ انور صابری
- بنگلہ دیش میں عیسائی مشنری سرگرمیاں : مولانا امین الحق محمودی
- مسیحیت پاکستان میں : ڈاکٹر نادر رضا صدیقی
- پاکستان میں عیسائیت کا احوال : ڈاکٹر نادر رضا صدیقی
- پاکستان میں عیسائیت کا فروغ : ڈاکٹر نادر رضا صدیقی
- پاکستان میں عیسائیت کا عروج : ڈاکٹر نادر رضا صدیقی
- اسلام کے خلاف عیسائیوں کے منصوبے : ڈاکٹر نادر رضا صدیقی
- العلمانية : بندر بن محمد الرباح
- العلمانية نشأتها وتطورها : ڈاکٹر سفر بن عبد الرحمن الحوالی
- العلمانية وثمارها الخبيثة : محمد بن شاكر الشريف
- فکر کے ہمراہ ایک سفر : آفتاب احمد سمنسی
- انسائکلوپیڈیا برٹانیکا
- اُردو ڈائجسٹ ۲۰۰۳ کے شمارے : ہندومت پر قاضی ذوالفقار احمد کے مضامین
- كتاب الهند : ابو ريحان البيروني
- ہندوؤں کا ہمدرد : امیر حمزہ
- ہندو ضمیات : ڈاکٹر عبدالحق
- فکر کے ہمراہ ایک سفر : آفتاب احمد سمنسی
- روس میں مسلمان قومیں : آباد شاہ پوری
- کمیونزم کا فتنہ : مولانا محمد اسحٰق صدیقی
- کمیونزم و سوشلزم کے سبز باغ : منشی عبدالرحمٰن خان
- سرمایہ دارانہ نظام : مولانا محمد احمد حافظ
- ماہنامہ ساحل : ۲۰۰۵ء کے مختلف شمارے

উৎসগ্রন্থ

- الغز والفكرى- (دراسات في الثقافة الإسلامية، لجنة المناهج)
- اساليب الغز والفكرى- على محمد جريشه، محمد شريف الزيبق
- الغز والفكرى في مناهج الدراسية - استاذ على لبن ، دار الوفاء، ۱۹۹۲ ء
- اخطار الغز والفكرى - داكثر صابر طعيمه، عالم الكتب
- ہلال وصلیب کا معرکہ - شفیق الاسلام فاروقی
- مغربی مستشرقین کے فکر و فلسفہ کا اثر : مقالہ از مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رح.
- "المستشرقون والاسلام : شيخ مصطفى السباعي رحـ
- الاستشراق : موقع شبكة مشكوة الإسلامية، موسوعة الشاملة
- الاستشراق : مازن بن صلاح
- موسوعة الغز والفكرى : على بن نايف الشحوذ
- ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين : مولانا سيد ابو الحسن على ندوي رحـ
- بحث الاستعمار الحديث : منقذ السقار
- الاستعمار احقاد و اطماع : محمد الغزالى
- العولمة : صالح الرقب
- گلوبلائزیشن اور اسلام : مولانا یاسر ندیم
- مغربی میڈیا اور اس کے اثرات : مولانا نذر الحفیظ ندوی
- اسلام اور جدید تجارت و معیشت : حضرت مفتی محمد تقی عثمانی مدظلہ
- المسلمون والعولمة : الأستاذ محمد قطب
- التنصير مفهومه وأهدافه ووسائله : على بن ابراهيم الحمدالنملة